অন্বেষা

শারদ সংকলন

১৪২৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

অন্বেষা

শারদ সংকলন

১৪২৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

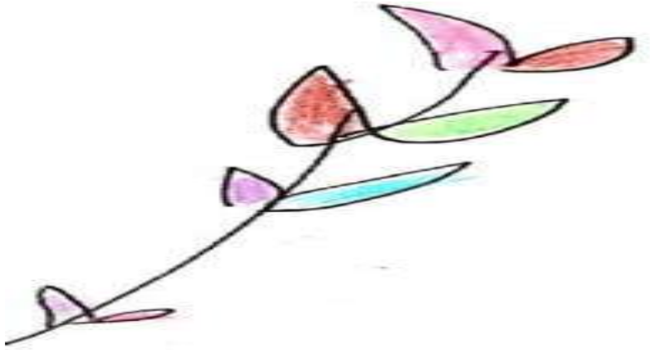

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখর পাল
ও
অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার
কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন
সি -৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি,
কলিকাতা - ৭০০০৯৪
Website : http://aricare.in/index.php
Email : aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in
দূরাভাষ : ৯১ ৯৪৩২২০৯৮৫ \ ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক : মৌসুমী মুখার্জী (৯৮৩০০৮০৮২৪)

সম্পাদকীয়

সৃষ্টির আদি রহস্য অনাবিল আনন্দ আহরণের মধ্যে লুক্কায়িত।আর এর মধ্যে কোন সংশয় নেই। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত আপামর জনসাধারণ চায় একটু বিশ্রাম। অন্য এক জীবন- সঙ্গে আনন্দ আর উল্লাস। মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ফেলে আসা দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ছুটে চলেছি ভিন্ন-ভিন্ন আনন্দের উৎস সন্ধানে।আর ফলস্বরূপ মানবজীবন ও মনুষ্যসৃষ্ট সমাজে বিভিন্ন উৎসবের পরিকল্পনা ও সেগুলির বাস্তবায়ন।সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি বদলায়। বদলায় মানবসম্প্রদায়ের চিন্তাশক্তির পরিসর ও আনন্দ আহরণের বিভিন্ন উপকরণ - এই তো রীতি চলমান জগতের।

ভিন্ন-ভিন্ন ঋতু সমাগমে প্রকৃতির রূপমাধুরী মনুষ্যকুলকে করেছে বিমোহিত।হয়েছে অত্যুচ কল্পনাশক্তির বিকাশ ও সেগুলির বাস্তবিক রূপ পরিগ্রহণ।এসেছে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। কখনো আমরা প্রকৃতিকে কল্পনা করেছি রুদ্ররূপে, - আবার কখনো জগৎজননী মাতৃরূপে। আর এহেন পৃথক পৃথক আঙ্গিকের কল্পনা জন্ম দিয়েছে শিল্প, কলা, সঙ্গীত আর উৎসবের-এরা যেন সহোদরা। একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শরতের আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘরাজি।প্রান্তরে প্রান্তরে কাশফুলের মেলা।স্বর্ণালী রৌদ্রের মাতাল করা আমেজ।শিউলি ফুলের মনমাতানো সুগন্ধ।আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে এক অভিন্ন আনন্দের উদ্রেক - এ কি বৃদ্ধ বর্ষার অক্টপাশ থেকে মুক্তির আনন্দ? মন চায় নুতন করে বাঁচতে। নুতন কিছু করতে।এ যেন কোন আনন্দময়ীর আগমনবার্তা।মা আসছেন পিত্রালয়ে,সপরিবারে-আনন্দে মাতোয়ারা হতে আর ভক্তকুলকে আনন্দ প্রদানে ও বরাভয় দানে।

শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব।এটা নিছক উৎসব নয়।সহিষ্ণুতা,সহযোগিতা ও সহমর্মিতা,যেমন মাতৃরূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত - সেইরকম ভাবনা নিয়ে এই উৎসব পালন করলে দেবী দুর্গার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

বাঙালির চিন্তায় ও মননে শারদোৎসব ও সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরম্পরা অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সংগঠনের মুখপত্র "অণ্বেষা" শারদ সংকলন ১৪২৯ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সংকলন প্রকাশিত হল। গুণী লেখক ও কবিদের কলমে সমৃদ্ধ এই শারদ সংখ্যা।কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ শারদ সংকলন সকলের সমাদৃত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়।যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংকলনের প্রকাশন সম্ভব হলো তাঁদের সকলের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।সর্বোপরি, গুনগ্রাহী পাঠকদের জানাই অফুরন্ত ধন্যবাদ ও শারদ শুভেচ্ছা।আপনাদের ভালবাসা ও সহযোগিতায় সফল হোক "অন্বেষা" ডিজিটাল পত্রিকার পথচলা।

কবিতা

মুক্তি সাধন বসু, বংশীধর মন্ডল, সুধাংশু শেখর পাল, অশোক কুমার মজুমদার, লীলাময় পাত্র, সুফল সাহা ও দেবাশীষ পাল ৫ – ১৯

গল্প

গৌতম রায়, চৈতালি দত্ত ও অশোক বিশ্বাস ২০ – ৩৮

প্রবন্ধ

উৎপলা পার্থসারথি, দেবাঞ্জন সুর, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময় দত্ত, সত্যব্রত মাইতি, কৃষ্ণেন্দু দাস ও রজত তরাত ৩৯ – ৬৭

ভ্রমণ কাহিনী

কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, তনুরুপা কুন্ডু ও দিলীপ কুন্ডু, তনুরুপা কুন্ডু এবং বিনয় কুমার সাহা ৬৮ – ৮৪

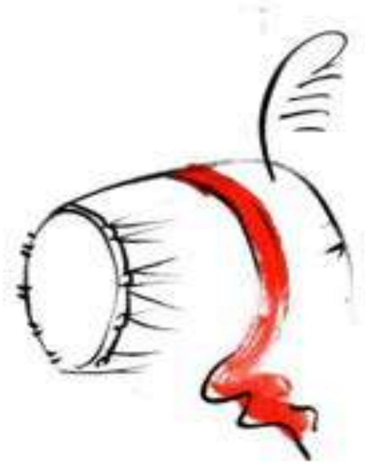

!! কবিতা !!

অনাসৃষ্টি বৃষ্টি

মুক্তি সাধন বসু

দিন শেষে এলে অবশেষে
পড়ন্ত বেলায় পূর্ণ যৌবনে
বৃষ্টি পায়ে সৃষ্টি সাজাতে।
এত রাতে কেউ নেই সাথে
নক্ষত্ররা নিভে গেছে কবে
নদীরা নীরবে শুয়ে আছে
মাটির কান্না বুকে চেপে।

সাগর সাজিয়েছিল মেঘ
জেগেছিল চাঁদকে লুকিয়ে
তটিনীকে ফিরে পেতে বুকে
এলোচুলে কল্লোলে হিল্লোলে
দেখা তবু পেলোনাকো কেউ
তট ছুঁয়ে ফিরে গেল ঢেউ
একরাশ বেদনার ইতিহাস।

জানিনা কি ভাবে
কি সোহাগে জাগাবে সবুজ
শূন্য মাঠে সোনালী ফসল
শুধু জানি এসেছো শেষের রেশে
সজলে কাজলে রুদ্র রোষে
শেষ রাতে এ দেশ ভাসাতে
ফিরে যেতে ধ্বংসের লীলায় মেতে।

নিজের বিচার নিজেই করি

বংশীধর মন্ডল

আমি এখন আমার সাথে কথা বলি,

নিজের জ্ঞানের বিচার নিজেই করি;

ভূতপেত্নীদের মৌনী ভাষায়,

মামদো ভূতেদের গোপন ভাষায়,

কান পাতলে শোনা যায় না,

বাতাস শোনে সব কথা।

আমি চরিত্রহীন নষ্ট দেহের বুভূক্ষায়,

নাকানি চোবানিতে ব্যগ্র;

হ্যাঁ, আমি দুশ্চরিত্রের মাঝে বাস করি,

বিধির বাঁধন ভাঙতেই গোপন কলঙ্ক ফাঁস,

চরিত্র বিচারে অতএব আমি কলঙ্কিত নায়ক।

হৃদয় এক সুখের তীর্থ, বিরহের বাগিচা,

সেখানে দক্ষিনা ফেললেই অকাতরে

মেলে মহা দর্শন

পিঁপড়েরাও রোমান্স করে আদুল গা'য়ে

ফাঁক ফোকর পেলেই ফুলশয্যায় এলিয়ে দেয় গা,

লিপ্সার স্বভাবে ঠিক যেন দুরুহ মানবী চরিত্র,

বাতাস শোনে মৌনী ভাষায় নুপুরের ছন্দে তাদের সংলাপ

দেহজ উপত্যকায় চুপিসারে সময়

তোলে হৃদস্পন্দন।

চাঁদ ক্রমশ হেলতে দুলতে ঢলে

গেলো পশ্চিমে

বাকরহিত বিহ্বল প্রেম, আয়াশে

করে গমনা গমন,

প্রেম নিবেদনের চিত্তসুখে সেও

নেশাজালে বদ্ধ

আমরা সবাই সেই ক্ষিদেতেই মরি,

স্বেচ্ছায় ধর্ষিত হলেও নিজের সাথে

শেষ বিচারে সন্ধি করি।

শহীদ হতে স্বপ্ন প্রস্তুত

বংশীধর মন্ডল

কখনো কখনো গভীর ঘুম ভেঙ্গে
হামাগুড়ি দিয়েছি স্বপ্নের খোঁজে
কখনো পিছমোড়া, ধরাধরি দুহাত
আলখাল্লা গা'য় গুনগুনিয়ে সংলাপ,
বেলা অবেলায় চষে ফিরেছি
পায়ে পায়ে,
মাড়িয়েছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সখের
সাজানো উঠোন।
জীবনভর ছড়িয়েছি সারাটা অন্তর
স্বপ্নের কুসুম বীজ, স্বয়ংবর শয্যায়
প্রসব গন্ধে-গন্ধে সময়ে বীজ ফেটে
উঁকি দিয়েছে ফুল জঠরের দুয়ারে।
ব্যাথা বেদনা লুকিয়েছে রক্তের আনাচে-কানাচে,
বদ্ধ এখন শয়ান আঁতুর ঘরের ঝাঁপিতে
ফ্যালফ্যালিয়ে বসে আমি মহাকালের প্রান্তরে,
মর্ম বাণীর মন্ত্রে সাজানো আড়ম্বরী মঙ্গলঘট,
সামনে যজ্ঞস্থল দাউদাউ আগ্নেয় শিখা।
জানু পেতে মাদুরে যোগমুদ্রায়, উর্দ্ধে প্রসারিত দু'হাত,
কাঁড়ি কাঁড়ি কুসুমস্বপ্ন হেলায় শুকিয়ে নিস্প্রান,
শহীদ হতে প্রস্তুত আমার স্বপ্নের মূলাধার।

অঙ্গীকার

লীলাময় পাত্র

ভালোবাসা আঁকা দুটো চোখ

কাছে ডাকে স্বপ্ন দেখায় ,

একলা প্রহর জুড়ে

তোমাকেই ফিরে পাওয়া

শুধু ভাবনায় ।

হারানো দিনের মতো

ফেলে আসা গান ,

মন যেন ছুঁতে চায়

সেই অভিমান ,

সুরে সুরে অনুরাগী

শুধু দুজনায়।

আগামী দিনের কাছে

তোমার আমার ,

কিছু তো দেয়ার আছে

সেই অঙ্গীকার ,

রঙে রঙে তাই লিখি

ভালোবাসায় ।

পালিয়ে যাওয়া

অশোক কুমার মজুমদার

তোমার মুখ উজ্জ্বল করে

নদীর জলে চাঁদের আলো

মাঝে দরিয়া, নায়েতে বসে

তোমাকে দেখা।

কলেজ   গেটে তোমার

জ্বালাময়ী ভাষণ,

পুলিশের লাঠিচার্জ

মিছিলটাকে ভেঙে দেয়;

নৌকোটা দুলছে,

জানিনা কটা লাশ পড়ে গেছে।

আনমনা মন

সুধাংশু শেখর পাল

নীরবে নিভৃতে বসি
কত না ছবি আঁকি
ভরে মোর মানসপট,
অতুল পাথারে না পাই তট,
ছায়া সুনিবিড় অতিকায় বট।
সজীব, সরস, সে সব চিত্র,
কত মনোরম, কত বিচিত্র,
আবেগের রঙে রাঙা,
প্রশান্তির তুলিকা;
মালা গাঁথে দেখি এক বালিকা।
শষ্যে শষ্যে ভরা, উর্বর অববাহিকা,
আরও কত ছবি, জীবন প্রবাহের,
উদ্ভাসিত হয় ছুঁয়ে মোর আবেগে,
ফেলে আসা মনোরম মুহূর্ত সকল,
সজীব সরস হয় ,করে যে আকুল।
সাথ বিতানোর অঙ্গীকার,
করে মোরে তিরস্কার।
বিধির বিধান কিংবা স্বেচ্ছা নির্বাসন?
সংশয়ে মোর মন হয় উদাসীন।
সংখ্যার খেলা খেলি যে এখন,

উন্মুক্ত প্রান্তরে উদাসী পবন।

প্রশান্তির হাঁসি কি হাঁসিতে পারি?

দায়িত্বের বোঝা আর সহিতে নারি।

কঠিন সব কামনা দিবস নিশি,

দংশে মোরে, পাইবে কি নিষ্কৃতি?

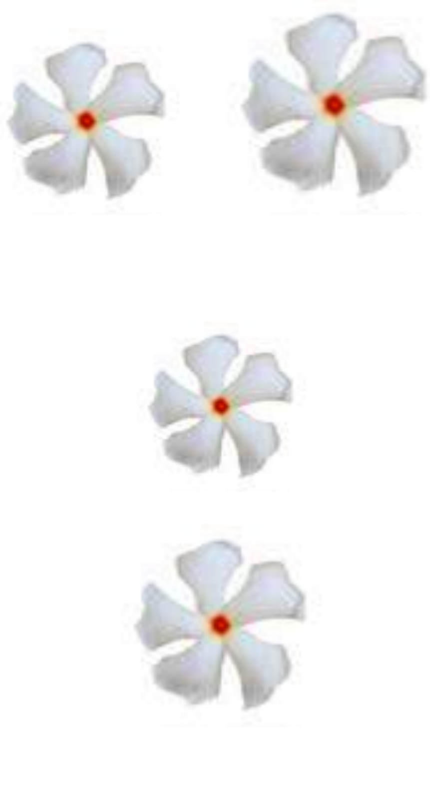

Festival

Sudhansu Sekhar Pal

Festivals! Round the year?

Oh, my dears, can you bear?

Festivals! Damn it, be regional,

National or international,

Have lost their significance-

That was age old and traditional.

Festivals, oh the joyful carnivals,

Are now the puppets of professionals!

In the disguise of internationals.

The festive dresses, luxury items, tours alike-

Are planned by them, not as we like.

The high pitch loud-speakers on festivals,

Beating their trumpets madly on liquor,

Doesn't it symbolize social and mental perversion ,

To draw mere attention!

See the crowd burst on already crowded roads,

Are ready to spoil your festive mood.

Bonus festivals! How surprising are those?

Be it winning the party election,

Release of leaders on bail, land acquisition-

Of course, on force, and many more to name.

Festivals are feathered with fame,

How can we deny festivals? They are indispensible,

Those continuing from days immemorial,

And should continue, in limit that is permissible.

People may baffle, if it crosses the limit,

Let's be frugal, pump and show? Let us omit.

Festivals, the platform of exhibiting creativity

Should not lose its creditability.

Developing a high ending theme,

For mere festive scheme,

Is it not foolish enough?

For a wild goose chase;

To exhibit for fun and vanity.

If you think, you have the talent,

Be an inventor of immense potent.

May think about a low cost housing complex,

For those homeless brothers.

In spite of creating another Taj Complex

Can't we decorate houses of those neighbours,

Who are none but like bonded labours.

Think about a drainage system,

To prevent inundation- should not be your aim ?

Let's develop themes, not for festivals,

Do it for the sake of humanity.

Blessings of God, we expect to gain,

From observing so called festivals– go down in vain!

Festivals, oh the basket of enjoyment

Are welcomed without harassment.

May be different across religions and races–

But should bring joy to everyone's faces!

ভেজা ব্যালকনি

সুফল সাহা

ডায়রির পাতায় জমেছে ধুলো,

শহরতলি আজ উদাসীন।

ঘন মেঘের জটিলতায়

মনটা আমার দিশাহীন।

একলা এই জানলার কার্নিশ

খুঁজে চলেছে তোমায়।

ক্রুদ্ধ মেঘের অবিরাম ঝলকানি

বড্ড অভিমানী এ সময়।

শীতল স্রোতের গতিধারা

এলোমেলো এ হাতছানি।

ক্লান্তির বিকেলে আনমনে দাঁড়িয়ে,

আমার প্রিয় ভেজা ব্যালকনি।

টাকার নাম সংকীর্তন

দেবাশীষ পাল

মানবের জাগ্রত দেবীর নাম কীর্তন,
আজি আমি কৃতার্থ চিত্তে করিব বর্ণন।
পার্স রুপি সিংহাসনে রুপি নামে অধিষ্ঠিতা দেবী,
তার কৃপায় ধরাধামে সম্ভব হয় যে গো সবই।
স্থান কিংবা পাত্র ভেদে নানা নামে ডাকা,
বাঙালির আদরের নাম তার টাকা।
অনেকেই তাকে তংখা বলে থাকে,
তাছাড়াও পাত্র ভেদে ও একে নানা নাম ডাকে।
পূজায় ক্লাবে দিলে নাম তব চাঁদা,
সেই পূজায় ব্রাহ্মণকে দিলে দক্ষিনা কয় দাদা।
স্কুলে দিলে কয় সবে ফিস,
শ্রমের উপরি হলে নাম বকশিস,
আবার হোটেলে খুশি হয়ে দিলে বলে টিপস।
ছেলে, বউকে দিলে হলো হাতখরচা,
ফালতু দিতে হলে বলে গেল গচ্চা।
বিয়েতে বরকে দিলে হয় বরপণ,
আর বিবাহ বিচ্ছেদে দিলে খোরপোশ কন।
অফিস কাছাড়িতে দিলে বেতনই তো বলে,
আবার শ্রমিককে দিলে মজুরি কয় সকলে।
সাময়িক কাউকে দিলে নাম তার ধার,
আবার ব্যাঙ্ক থেকে নিলে ঋণ হয় তার।

আদালতে দিলে সবে জরিমানা কয়,

আর সরকারকে দিলে কর ই তো হয়।

অপহরণে দিলে নাম মুক্তিপণ,

রিটায়ারমেন্ট হলে নাম পেনশন।

জোর করে নিলে নাম তোলাবাজি ,

যদিও দিতেই হয়, হয়ে নিমরাজি।

তবে ভোট কিনতে অনেক নাম আছে যে তাহার,

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী কিংবা লক্ষীর ভান্ডার।

খেয়া পার হতে নাম পারানি যে হয়,

রাস্তায় দিতে হলে টোলট্যাক্স ই হয়।

অসহায়কে দিলে বলে যে ভিক্ষা,

সাম্মানিক বলে যদি দেয় শিক্ষা।

ফকিরকে দিলে হয় যে গো দান,

ফড়েরা পেলে বলে কমিশন।

সাধু সন্ন্যাসীকে দিলে নাম তার প্রণামী,

দালালকে দিলে হয় যে তা সেলামি।

আড়ালেতে দিলে ঘুষ বলে সবে,

ডাক্তারকে দিলে ভিজিট ই তো কবে।

অনলাইন কেনায় বলে ক্যাশব্যাক,

সাইবারে মাল বলে সরায়, করে নিয়ে হ্যাক।

দুর্গতকে দিলে ত্রাণ বলে যারা,

গাড়িতে দিলে তাই হয় ভাড়া।

নেতা নিলে নাম যে গো হয় কাটমানি,

মহাজনে নিলে মোর সুদ বলে জানি।

হাতে হাতে দিলে নগদ যে তার নাম,

মদ খেয়ে টাকা দিলে হয় তার নাম

সকলেই জানে তাকে বলে দাম।

আর সেই মদ ই যদি কাউকে গিললো,

টাকা নয়, জীবন দিয়ে চুকাতে হয় যে গো মূল্য।

!!গল্প!!

লকডাউন

গৌতম রায়

- কি গো? ঘুমুলে নাকি?

ইন্দ্রর-ও ঘুম আসছে না কিছুতেই। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছে এতক্ষণ। খুব চেষ্টা করছে যাতে নাড়াচাড়ার শব্দে সীমার না ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু এখন সীমার এই প্রশ্ন শুনে এবার সাড়া দিল ইন্দ্রজিত।

- না, ঘুম আসছে না।

ইন্দ্রর থেকে সাড়া পেয়ে খুব কাছে সরে আসে সীমা। তারপর হাতটা আলগা করে ইন্দ্রর গায়ে তুলে দিয়ে বলে ওঠে -

- দেখো, এতদিন পর সেই দিনটা আসছে, সবকিছু ঠিক থাকলে কাল বাড়ি ফিরবো আমরা আজ দুমাসেরও বেশি সময় পর। কিন্তু আমার না খুব কষ্ট হচ্ছে এখন গো! এদের ছেড়ে ফিরে যাবো!

- আবার কখনো এখানে আসতে পারবো কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না যে এই পরিবারের সাথে আমাদের কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই, অথচ এরা কতো বেশি আপন। আমাদের নিজেদের আত্মীয়দের চেয়েও যেন আপন এরা। অথচ দেখো, এই দু-তিন মাসে আগে অবধি তো ওদের চিনতামও না আমরা! কী আশ্চর্য বলো তো।

- হুম্ আমিও সেটা ভাবছি। এদের ঋণ কোনোদিনই কি আমরা শোধ করতে পারবো? কোনোভাবেই এই ভালোবাসার ঋণ শোধ করা কোনোদিনই যাবে না। এরকম মানুষজন সত্যিই আমি দেখিনি আগে। তুমি একটু উলটো করে ভাবো তো, যদি এরা কলকাতায় এভাবে আটকে পড়তেন আর রাস্তায় আমি এদের দেখতে পেতাম - আমি কি তাদের এইভাবে বাড়িতে ডেকে আনতাম? না আমরা এতো আদর যত্ন দিয়ে তাদের এই দু-তিনমাস রাজার আদরে রাখতে পারতাম? আমি তো মোটেই পারতাম না, তুমি কি পারতে?

- না গো, আমিও পারতাম না। বরঙ্ তুমি ওদের বাড়িতে নিয়ে এলেও আমি পরের দিনই হয়তো ওদের অন্য কোনো গেস্ট হাউসে বা হোটেলে তুলে দিয়ে আসতাম।

- সে তো জানি আমি, কিন্তু আবার ভাবো - যদি সেইসময় কোনো হোটেল খোলা না থাকতো? যদি গেস্ট হাউসগুলোও সব বন্ধ করে দিত? তখন কি করতে? আমি, আমরা কেউই এই অযাচিত ঝামেলা নিতে

চাইতাম না। তাছাড়া একদিন-দুদিন যাওবা হয়, এতো কতদিনের জন্য হবে - তখন বুঝতেও পারতাম না। তাহলে?

- সত্যিই তাই, এরা সত্যিই মানুষ নয়, দেবতা। দেবতা তো আর নিজে থেকে এসে কিছু করে না, বিপদের দিনে এরকম কিছু মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তারাই হল আসল দেবতা। এখানে জাত, পাত, ধর্ম – এসব কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমি এরকম গল্প শুনেছি, কিন্তু এখন চাক্ষুষ সেরকম মানুষ দেখলাম আমরা। জানো, কাল যখন তুমি টিকিট কেটে নিয়ে এলে, Visa ও Extend করে নিয়ে এলে - আমি আনন্দে নাচছিলাম। আর সেই খবরটা যখন আনন্দ করে আম্মাকে বলতে গেলাম - আম্মা আমায় জড়িয়ে ধরে কি কাঁদলো! আমি অসহায়-র মতো দেখলাম আম্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে - বেটি, আমায় ছেড়ে তোরা চলে যাবি? আর জানো, তারপর থেকেই আমিও ভেতরে ভেতরে খুব কাঁদছি। দেখো এখন তো আমাদের খুব আনন্দে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি বলছি গো, এখন আর এখান থেকে চলে যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছে না আমার। কাল শামিম আর শাহিনও সন্ধ্যে বেলায় এসে বলল - ভাবী, তোমার কাল - পরশুই চলে যাবে? আমি কিছুই বলতে পারলাম না, মাথা নীচু করে থাকলাম। আর তার মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওরা দুই বোনও কাঁদছে। এ কী মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়লাম বলো তো?

- ঠিকই। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় জন্মসূত্রে আমরা সমস্ত আত্মীয়দের প্রথম থেকেই খুঁজে পাই না। কয়েকজনকে পাই নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপর সারাজীবন ধরে বাকীদের খুঁজে নিতে হয়! - জানো, কাল যখন শহিদুল আমায় গাড়ি করে কনসুলেট অফিসে নিয়ে গেল, মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম যেন Visa টা Extension করে দেয়, কারণ এটাতো আর আমাদের ইচ্ছেতে Expiry date lapse হয়নি! এ এক আজব অবস্থাতে পড়ে Lapse হয়েছে। এর জন্যে আমরা তো কেউই দায়ী নয়। শহিদুল তো ওখানের অনেককেই চেনে দেখলাম। বড়ো এক অফিসারের কাছে গিয়ে আমায় দেখিয়ে এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিলো যে Visa সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় Extension করে দিল। আর জানো, কী আশ্চর্য, ঠিক তার পর থেকেই আমার মনটা হটাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল। বলতে গেলে একেবারে দুঃখে ভরে গেল। শহিদুল কেও দেখলাম - ভেজা চোখে মুখে হাসি নিয়ে বলল - তাহলে দাদা, সব কাজ হয়ে গেল। আপনাদের জোর করে সেদিন বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। কী ভেবেছিলেন জানিনা, আমি অবশ্য সেসব নিয়ে একটুও ভাবিনি তখন। শুধু ভেবেছিলাম - এটা আমার কর্তব্য, এটাই আমার করার দরকার। আর তাই আপনাদের জোর করেই নিয়ে এসেছিলাম আমাদের বাসাতে। কী জানি আপনাদের আদর যত্ন আমরা ঠিক করে করতে পারলাম কিনা, তবে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে - ক্ষমা করবেন দাদা।

- সীমা, আমি একেবারে নিশ্চিন্ত যে ওর কথাগুলোর মধ্যে তখন কোনোরকম বানানো, বা মনরাখা কথা বা শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক কথা ছিল না। ওটা ছিল ওর একেবারেই মনের ভেতরের কথা।

- কী বললে তুমি তখন ওকে?

- কী আর বলবো? আমি ওকে একটু বকাবকি করলাম। বললাম - কী হচ্ছে শহিদুল? আমরা কোথায় জন্ম জন্মান্তর তোমার কাছে, তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, আর তুমি কিনা এইসব বলছ আমায়? একদম বলোনা এইসব। তুমি ভাবোতো, যেদিন আমরা হটাৎ সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবার খবর পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম একটু কম পয়সার কোনো হোটেলে বা গেস্ট হাউসের খোঁজে, সেদিন তুমি না বাঁচালে আমরা কোথায় যেতাম তখন? তুমি জানো তো - আমরা হনিমুনে এসেছিলাম এখানে। আমাদের দুজনেরই পূর্বপুরুষরা এই দেশে থাকতেন একসময়। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা হনিমুনে বাংলাদেশেই বেড়াতে যাবো। পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি দেখে আসবো। আর বুঝতেই তো পারছো, হনিমুনে এসে তো আর আজেবাজে হোটেলে থাকতে পারি না। তাই দামি হোটেলে থেকে ততদিনে সব টাকা – পয়সাও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে এটা ঠিক, তুমি সেদিন যদি ওইভাবে জোর করে ধরে না তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে আমাদের যে কি অবস্থা হত তা ভাবতেই শিউরে উঠছি!

- জানো, এরা মানুষজন ভীষণ-ই ভালো। আমার, সত্যি বলছি এসবের কোনো ধারনাই ছিল না। তবে এটা অনেকের থেকেই শুনেছিলাম যে বাংলাদেশের মানুষরা খুব-ই অতিথি পরায়ন হন, কিন্তু সেটা যে একেবারে এই পর্যায়ে, তা আমার চিন্তাতেই ছিল না। কে করবে বলো তো - এই যে প্রায় দুমাসেরও বেশি সময় আমরা আছি এখানে - কি রাজার হালে রেখেছে বলোতো আমাদের? এই চারদিকের লকডাউনের মধ্যেও কিভাবে ঠিক ভালো ভাবে নানারকম বাজার করে আনছে, দারুন দারুন রান্না করছে - আমি তো ভাবতেই পারিনা এসব। এতোকিছু দেখে না আমি নিজের মনেই নিজেকে একটু অপরাধী ভাবছি। নিজে যে কতটা সংকীর্ণমনা - সেটা এখানে এসে খুব ভালো করে উপলব্ধি করছি।

- আর বলো কেন? আমি তো এখানে আসার পরেই শহিদুলকে কিছু টাকাপয়সা দিতে গেলাম। এমনকি পরে তো একদিন বললামও - চলো শহিদুল, তোমার সঙ্গে বাজার যাই। আমিও বাজার করবো। শহিদুল তো আমার কথা শুনে একেবারে লম্বা করে জিভ বার করে বললো - তোবা, তোবা, আমরা কখনও কোনো অতিথির থেকে কোনো খরচপাতি নিইনা দাদা। আমায় ক্ষমা করবেন। বরং আমরা যখন কলকাতায় আপনাদের বাসায় গিয়ে থাকবো, বেড়াতে যাবো, তখন যতো ইচ্ছে যত্ন আত্তি করবেন দাদা আমাদের। আপনারা আমাদের সম্মানীয় অতিথি। আল্লা তালার অসীম দয়ায় কয়েকদিনের জন্য আপনাদের আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমায় আর এসব বলে ছোটো করবেন না দাদা। এসব শুনলেও মন খারাপ হয়ে যায় আমার।

- এরপর আর কি বলবো বলো তো? অথচ ওর একার আয়েই এই এতো বড়ো সংসার চলছে ওদের! মা, দুইবোন - আবার দুই বোন-ই ডাক্তারি পড়ে, কতো খরচ ভাবো তো একবার! আমি তো ভাবতেই পারি না যে কি করে ওর একার ইনকামে সবকিছু এতো হাসিমুখে চালাচ্ছে। আর শুধু একা ও-ই বা কেন? ওর মা-র মুখ দেখেই তো মনে হয় একেবারে স্নেহ-মায়া-মমতার যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি! সব সময়েই যেন উনি হাসছেন আর বোঝাতে চাইছেন - আমি তো আছি খোকা, তোর ভয় কী? আমি না সেই প্রথম দিনেই ওনাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কি সুন্দর মানুষ! কী ভীষণ আন্তরিকতা!

- নিশ্চয়ই! ওদের পুরো পরিবারই ওই জন্যে এত ভালো। শহিদুলের দুইবোন কে দেখো - যেন সবসময় সদা জাগ্রত হয়ে আছে আমাদের কি লাগবে, কি প্রয়োজন, দেখার জন্যে। কোনো কিছুর দরকার হলে, বলতে গেলে কিছু বলবার আগেই যেন ওরা সব বুঝে যায়। - আমায় সেদিন শামিম কি বললো জানো, বললো - ভাগ্যিস এই লকডাউন এর সময়ে তোমাদের পেয়েছি! অন্য সময় তো আমরা দুজনেই হোস্টেলে থাকি! তোমার সঙ্গে তাহলে আলাপ-ই হতো না! আমি আবার হাসতে হাসতে বললাম - ওহো! বুঝেছি, তার মানে আমরা অন্যসময়ে এলে তোমাদের আর দেখাই পাবো না। শামিম কিছু বলার আগেই শাহীন বললো - তা কেন? তোমরা এরপর যখন আসবে - আগে থেকে একটু জানিয়ে দিও প্লিজ! আমরা দুজনেই তখন ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসবো। তোমাদের নিয়ে তখন আমরা আসল সবুজ বাংলাদেশ দেখাবো। আমাদের দেশের বাসা - গোলাপগঞ্জ। সেখানে নিয়ে যাব। কয়েকদিন থাকব সেখানে। একটা কি সুন্দর ছোট্ট নদী আছে ওখানে। এঁকেবেঁকে আসতে আসতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সারা বছর ওই নদী হেঁটেই পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় সে নদীর চেহারা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। তখন কী স্রোত! নদীর দু - পারে সবুজ ক্ষেত। যতদূর দেখা যায় ধান জমি, চাষীরা কী সুন্দর চাষ করে সেখানে। সেখানকার বাতাসটাই কী মিষ্টি গো। এখানে, এই ঢাকা শহরে বসে থেকে সেসব কিছুই বুঝতে পারবে না। খুব সুন্দর জায়গা সেটা। সেই শুনে শামিম বললো - আমরা তো আগে স্কুলে পড়ার সময়ে প্রতিবছর যেতাম ওখানে স্কুলে ছুটি পড়লে। আর আসার সময় আমরা দুবোন - কাঁদতে কাঁদতে আসতাম। জানো, আমরা নিজেরাই নিজেদের জুতো লুকিয়ে রাখতাম। ভাবতাম - জুতো না খুঁজে পাওয়া গেলে - আর তো বাড়ি ফিরতেই হবে না। ভেবে দেখো একবার বুদ্ধিটা!

- না সীমা, আমি দেখছি - এরা মনে হয় একটু বেশিই ভালো, কিন্তু এই বাংলাদেশের মানুষরাই যেন সবাই খুব ভালো। খুব সরল আন্তরিক। তুমি ভেবো দেখো, আমরা সেই যে চট্টগ্রামে গেলাম, চট্টেশ্বরী মন্দিরে গেলাম, সেই যে কি যেন ছেলেটা কি নাম যেন - হায়দার, ওই তো কিরকম গর্বের সঙ্গে ওখানকার জায়গার স্থান মাহাত্ম সব বোঝালো। ওই তো বললো ওই বাটালি পাহাড়ের ওপরের সেই সুন্দর পার্কটার কথা, না হলে তো জানতেই পারতাম না সেটা। ওই তো বললো - কক্সবাজারে কোথায় কোথায় যাবো, কোথায় কম পয়সায় ভালো হোটেল আছে, ওখানে কোথায় বৌদ্ধদের প্রাচীন মন্দির আছে, তারপর ওখান থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কিভাবে যাব, কোথায় লঞ্চের টিকিট পাব - সব একেবারে পাখি পড়ার মতো করে বুঝিয়ে বলে, জোর করে আমাদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে চা - টা খাইয়ে - তবেই ছাড়ল। বুঝতে পারছো না, এখানকার মানুষরা আসলে তাদের মাতৃভূমিকে ভীষণ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। এই যে বাংলাভাষা আজ সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত একটা ভাষা - এতো এখানকার মানুষদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমরা সত্যি বলতে কি - বাঙালী বলে নিজেদের নিয়ে খুব গর্ব করি, কিন্তু সেই বাংলা ভাষার জন্য আমরা কতোটুকু কি করেছি? দেখলে না ঢাকায় শহীদ বেদী, সাবার-এ শহীদ স্তম্ভ। কতো মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে এরা শুধু নিজের মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। আমরা সেই তুলনায় কি করেছি? আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষই এখন বাংলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পায়, বাংলা ভাষায় কথা বললে নিজেদের Back dated ভাবে, তাই না? বেশির ভাগ মানুষ একটা কথা বলতে গেলে তার মধ্যে দশটা বাংলা

ছাড়া অন্য ভাষা ঢুকে যায়, বাংলিশ ভাষায় কথা বলে। এখানকার মানুষদের দেখেছো - আমি তো প্রায় সব মানুষদেরই দেখেছি - পরিপূর্ণ বাংলায় কথা বলতে! কী মিষ্টি শুনতে লাগে না? অনেক কিছু শেখবার আছে আমাদের এঁদের থেকে। এঁদের কথার মধ্যে একটা যেন অদ্ভুত মাটির গন্ধ আছে, সবুজ প্রাণ আছে, যা আমাদের নেই। আমরা বড্ড বেশি মার্জিত, অভিনয় পটু!

- আচ্ছা তোমার মনে আছে – সেই যে সেন্ট মার্টিন যাবার সময়ে আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সাথে - কি যেন নাম - খালেদ মিঞা। আমাদের দেখেই কেমন বুঝে গেল আমরা কলকাতা থেকে আসছি! তারপর জানলার ধারে ভালো সীট আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে পেছন দিকে বসতে গেল। বলল - দাদা - দুচোখ ভরে দেখে নিন। বাংলাদেশের সৌন্দর্য বড়ো সুন্দর, বড়ো মিষ্টি। আর দাদা, ওই বামদিকে দূরে যে তীর দেখা যাচ্ছে - ওইটা কিন্তু বার্মা। আগে এই কক্সবাজার থেকেই বার্মা যাওয়া যেত লঞ্চে। এখন আর যাওয়া যায় না।

- হুম্‌, সব – ই মনে আছে। আচ্ছা - সেই যে ওখানের হোটেলের ছেলেটা জোর করে কি একটা মাছ ভাজা খাওয়ালো, মনে আছে ওই মাছটার নাম? আমি তো এর মধ্যেই ভুলে গেছি। শুধু এটা মনে আছে - এতো সুস্বাদু মাছ আমি আগে মনে হয় না কোনোদিনও খেয়েছি বলে। আমি এমনিতেই মাছ খেতে বেশি ভালোবাসি না, কিন্তু ওই মাছটা খেয়ে একেবারে মন ভরে গিয়েছিল। আমার মনে আছে – ওই ছেলেটা বলেছিল – ওই মাছটা নাকি শুধুমাত্র ওই সময়েই সেন্ট মার্টিনেই শুধু পাওয়া যায়।

- হ্যাঁ গো, অপূর্ব খেতে। আমার এদের এখানের রান্নাবান্না খুবই ভালো লাগল - শুধু ওই পিঁয়াজ রসুন দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে আমার একটুও ভালো লাগেনি। তারপর একদিন প্রায় জোর করেই আমাদের মতো সরষে–পোস্ত–কাঁচা তেল দিয়ে ইলিশ মাছের ভাপা করলাম। শামিম তো অবাক। বলল - ভাবী তুমি পেঁয়াজ ছাড়া রসুন ছাড়া এরকম সুন্দর রাঁধলে কি করে? ওরা সবাই কিরকম সেদিন মজা, মজা বলে খেল ওটা। তাই না বলো? আচ্ছা, এইসময় এখানে অত বড়ো ইলিশ মাছ পায় কোথা থেকে? আমাদের ওখানে তো পাওয়া যায় না।

- আমাদের ওখানে পাবে আর কি করে? গঙ্গায় নোংরা ফেলে ফেলে জলের আর কিছু কি অবশিষ্ঠ আছে? পদ্মায়, যমুনায় এখানে তো কোনো দূষণ করতে দেয় না। এরা জানে এই রুপোলি শস্য এখানের আসল সোনা। তাই তাকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই যে আমরা মাওয়া তে গেলাম, সেই যে-যেখানে পদ্মার ওপর নতুন সেতু তৈরি হচ্ছে, যেটা হলে বাস সোজাসুজি কলকাতা থেকে ঢাকা আসতে পারবে, ওখানে দেখলে না শয়ে – শয়ে ভাতের হোটেল। পদ্মা থেকে মাছ ধরে আনছে মাঝি - একেবারে হাজার হাজার জীবন্ত ইলিশ, আর খদ্দের যে মাছটা পছন্দ করে দিচ্ছে সেটাই কেটে ভেজে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, যদিও জায়গাটা মাছ ভাজার গন্ধে একেবারে সরগরম, গন্ধে পাগল পাগল অবস্থা, কিন্তু ভাবো তো - ওই কয়েক শো লোক সেই মাছভাজা ভাত খাচ্ছে তারপর লঞ্চে উঠছে। অবশ্য শহিদুল বলল - যে ইলিশ মাছের আসল স্টক নাকি মেঘনা নদী থেকে আসে।

- এখানের মিষ্টিও তো কি ভালো খেতে না? সেই কোথায় যেন- সাবার, ওখান থেকে ফেরার সময়ে একটা বড়ো দোকানে মিষ্টি খেলাম! আহা, কি অপূর্ব খেতে!

- হ্যাঁ, সেটা ভালো, কিন্তু ওই যে ঢাকা আসার সময়ে সেই যে ফরিদপুরে বাসটা দাঁড়াল, ওখানে সেই যে কাঁচাগোল্লা খেয়েছিলাম, মনে আছে? আহা! কী অপূর্ব স্বাদ! আমি জীবনে অতো সুন্দর মিষ্টি কোথাও খাইনি। বাসে করে অতো পরিশ্রম করে ঢাকা আসা একেবারে স্বার্থক হয়ে গিয়েছিল। তবে এটাও ঠিক, আমি ঠিক করেছিলাম বাসে আসব, তার প্রধান কারণই ছিল খুব ভালো করে দেখতে দেখতে আসবো - এই দুই বাংলায় বাইরে থেকে দেখে কি কি তফাৎ বোঝা যায়। কিন্তু আমি কি বোকা, তফাৎ হবে কি করে? একই আকাশের তলায় একই সবুজ মাটির পৃথিবী যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একই এবং একই ভাষা – মাতৃভাষা, একই কবির রচনা দু – দেশের জাতীয় সঙ্গীত! বাংলাদেশের অনেকগুলো জায়গাই তো ঘুরলে, আমাদের দেশের সঙ্গে কোনো তফাৎ দেখতে পেলে কি? সেই একই ধরনের রাস্তা, ঘাট, নদী, বাড়িঘর, মানুষজন, আর তাছাড়া এটা তো একটাই দেশ ছিল! কি জানি কার কি স্বার্থের কারণে এই সুন্দর দেশটাকে দু – টুকরো করা হয়েছিল! এসব ভাবলেই মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

- আচ্ছা, শাহীন সেদিন যে মিষ্টিটা খাইয়ে ছিলো সেটার নাম কিগো? কত করে মনে রাখার চেষ্টা করলাম - ঠিক ভুলে গেলাম, ওই ধরনের কোনো মিষ্টি তো আমাদের ওখানে পাওয়াই যায় না, কি নাম গো মিষ্টিটার?

- হ্যাঁ, মনে আছে, ওটার নাম বাকলাভা, ওটা আসলে তুরস্কের মিষ্টি, ঢাকাতে দু – একটা দোকান এখন তৈরি করে। দারুন খেতে কিন্তু!

- তুমি এটা ভেবে দেখেছ যে এই লকডাউনের মধ্যেও ওরা কিভাবে এইসব জিনিস জোগাড় করে এনেছে?
- আমি তো ভাবতেই পারি না। আমি মা কে ফোন করে জেনেছি - এখানেরই মতো দু – এক ঘন্টার জন্যে খুব দরকারি জিনিসপত্রের দোকান খুলছে। অবশ্য ওষুধের দোকান খোলা থাকছে সব সময়। কিন্তু দেখো ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ঠিক বাজারে গিয়ে এতো জিনিসপত্র কিনে আনছে – শুধুমাত্র আমাদেরই জন্যে। সত্যি গো, এইসব মানুষের তুলনা হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ওখানে বেশিরভাগ ক্রাইমের সঙ্গেই কিভাবে যেন মুসলিমদের নাম জড়িয়ে যায়। আমরাও বোধহয় মনের ভেতরে একটু একটু করে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি করে ফেলি ওদের জন্যে। কিন্তু এখানে এসে, এখানকার সমস্ত মানুষদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়ে, আমার ধারণা একেবারে মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে। এরা- ই তো আসল দেবতা। মানবতাবোধ – এখানকার মানুষদের থেকেই শেখা উচিত।

- কী জানি, আমাদের দেশে ওই যে মুসলিম সম্প্রদায় আছে, তাদের বেশিরভাগেরই অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। তার ওপর বেশীরভাগের কোনো সেরকম শিক্ষা দীক্ষাও নেই। তাই মনে হয় নানান ভুলভাল কাজে ওরা জড়িয়ে পড়ে ওরা খুব সহজে। তাছাড়া ওইসব ছেলেদের উস্কানি দেবার মানুষেরও তো কোনো অভাব নেই। ফলে সব ভুলভাল কাজে ওদের নাম জড়িয়ে যায়। আমাদেরও তাই ধারণাটা খারাপ হয়ে যায়। আমি এখন বুঝতে পারি , ওরা ভালো মানুষ হয়ে ওঠার নিশ্চয়ই কোনো সুযোগ পায়নি। হয়তো এটা সেই Have এবং

Have-nots দের বিভেদ! আর তাছাড়া সব জাতে, সব ধর্মেই তো ভালো আর খারাপ - এই দু – ধরনের মানুষ-ই থাকে।

- কিন্তু কটা বাজে সে খেয়াল আছে? রাত যে শেষ হতে চলল! ঘুমুবে কখন?

- নাহ্ , আজ আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে। আর এখানের এই শেষ রাতটা নাইবা ঘুমোলাম। আমার তো সেই ঢাকা আসা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড – পরপর ছবির মতো ভেসে আসছে মনে। ইস্, আবার কবে আসতে পারবো গো এই দেশে? আমাদের বাপ – ঠাকুর্দার এই পূর্ণ ভূমিতে?

- আসতে হবেই গো, একবার নয়, বারবার আসতে হবে এখানে। এই ভালোবাসার টানের দেশে। চিরঋণী হয়ে থাকার দেশে।

- জানো, আমার খুব ইচ্ছে ছিল আরেকবার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, রমনার মাঠ, মেলার মাঠে যাবো। এইসব জায়গার কতো গল্প শুনেছি। বাবা – কাকার মুখে কতোবার শুনেছি বঙ্গবন্ধুর সেই উদাও আহ্বানের ডাক, সেই দৃঢ় প্রত্যয় – আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না। উহ! গায়ে কাঁটা দেয় সেসব মনে পড়লে। আর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যে ভাবে সবকিছু রেখে দিয়েছে, এমনকি দেওয়ালের সিঁড়িতে রক্তের দাগগুলো অবধি একই রকম রেখে দিয়েছে এঁরা, আমার তো এসব দেখে চোখে জল চলে এসেছিল। একবার ভাবো, বাচ্চাটাকে অবধি ওরা রেহাই দেয় নি। কী মানুষ সব! পাকিস্থানি গুন্ডা! রাজাকার!

কিছুক্ষণ দুজনের মুখেই কোনো কথা এলো না। ঘুম যেন আজ দুজনের চোখ থেকেই চলে গেছে একেবারের মতো। শুধু যে সেসব এতদিন পর বাড়ি ফিরে যাবার সুযোগের আনন্দে - তা নয়। নতুন এই আত্মার আত্মীয়দের থেকে আর কিছুসময় পর বিদায় নেবার ব্যাথাও মনে বেশ কষ্ট দিচ্ছে ওদের। কিন্তু কিছু তো আর করার নেই। বাংলাদেশ একসময়ে ভারতের অংশ থাকলেও বর্তমানে সেটি বিদেশ। বিদেশ বিভূঁই – এ এতো দীর্ঘদিন পড়ে আছে ওরা নিরুপায় হয়ে, তারও ওপর আবার দুজনের ভিসার তারিখও পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। তাও যে সেটা কিছুদিন আরো বাড়ানো গেছে - এটাই তো অনেক! আর ঘটনাচক্রে ওদের সঙ্গে শহিদুলের দেখা হয়ে গিয়েছিল, তাই ওরা এরকম এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এসে থাকতে পেরেছিল।

অবশ্য, শুধু শহিদুল কেন, অন্য কারোর চোখে পড়লেও হয়তো তারা সম্ভব হলে সেই একই কাজ করতো। এখানের মানুষজন যেন সবাইকে ভালোবাসার জোরে, ভালোবেসে কাছে টেনে নেবে বলেই বসে আছে। অবশ্য, শহিদুলের এই পরিবার যেন বড্ড বেশি ভালো। যেমন সে নিজে, তেমনি সুন্দর মনের মানুষ তার মা আর দুই বোন। এই মানুষগুলিকে এতো কাছ থেকে না দেখলে হয়তো মানুষ যে কতো ভালো আর পরোপকারী হতে পারে, এটা জানাই হতো না।

পূব আকাশে একটু একটু করে আলো ফুটে উঠছে। পাখিদের ভোরবেলার সম্মিলিত ঐক্যতানও শুরু হয়ে গেছে। কতো অজানা পাখি কতো অজানা সুরে সুরের সাধনা শুরু করে দিয়েছে।

ভোরের দিকে দক্ষিণের জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা ঠান্ডা বাতাস আসছে। আর এই সময়েই ওরা দুজনে নিজেদের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো দরজায় ধাক্কার শব্দে। দরজায় বোধহয় শাহীন ধাক্কা মারছে। ইন্দ্র শুনতে পেল শাহীন ডাকছে – আপা, আপা - উঠে পড়ো, বেলা হয়ে গেল তো। তোমাদের তো ফ্লাইট আছে, দেরী হয়ে যাবে।

ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়লো সীমা। ইন্দ্র দরজা খুলে দিল। ইন্দ্র ঘড়ি দেখলো প্রায় সাড়ে ছটা বেজে গেছে। বেলা এগারোটা কুড়িতে কলকাতার ফ্লাইট। ইন্টার ন্যাশনাল ফ্লাইট অন্ততঃ দু – ঘন্টা আগে রিপোর্টিং। তার ওপর এয়ারপোর্ট অনেকটা রাস্তা। আর ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হটাৎ কোনোদিন এখানের রাস্তায় যদি দেখা যায় – একেবারে ফাঁকা, ট্রাফিক জ্যাম নেই, বুঝতে হবে যে কিছু গন্ডগোল আছে। রাস্তায় বেরুনো ঠিক হবে না। অবশ্য করোনার পর এখনও তো একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। একটু একটু করে আবার সব স্বাভাবিক হচ্ছে। তাই আশা করা যায় - রাস্তায় খুব বেশি ভীড় থাকবে না আজ। তবু, সাবধানের তো মার নেই। সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ওরা দুজনেই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিল। শেষ মুহূর্তের ব্যাগ গোছানোও প্রায় শেষ। ওদিক থেকে আম্মার ডাক শোনা গেল – নাস্তা দিয়েছি। এসো, আর দেরী কোরোনা তোমরা, এসো তাড়াতাড়ি।

ওরা ডাইনিং স্পেশে – এ এসে বসল। দেখল - শামীম আর শাহীন - দুজনেই কেঁদে চলেছে । বারবার চোখ মুছে মুছে ওদের চোখ লাল হয়ে গেছে। আম্মা কে দেখেও মনে হচ্ছে - আম্মা সারা রাত ঘুমোননি। চোখ লাল, ওদেরই জন্য আজ অনেক সকাল সকাল উঠে খুব সুন্দর করে লাচ্ছা পরোটা আর চানা বানিয়েছেন। সাথে স্যালাড আর আচার, কোনো দিকে কোনো ত্রুটি নেই।

ওদের দেখে শুনে এদের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। ইন্দ্র তবু বোঝাতে চেষ্টা করলো শাহীন আর শামীমকে – কেন তোমরা এরকম কাঁদছো গো? তোমরা এরকম কাঁদলে আমাদেরও কি চলে যেতে ইচ্ছে হবে, বলো তো? কিন্তু এখানে তো এভাবে থেকে যাওয়া যায় না, তাই না? আমি তো বলছি – কিছুদিন পর – হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের সময়ে অথবা ১লা বৈশাখে এখানে আবার আসবো। এখানে না এসে কি থাকতে পারবো আমরা? লক্ষ্মী মেয়ে, তোমরা কেঁদো না, আর তাছাড়া শহিদুলের সাথে তো আমার কথা–ই হয়ে গেছে তোমরা সবাই মিলে দুর্গাপুজোর সময়ে আমাদের ওখানে যাবে। আমরা তোমাদের সমস্ত কলকাতা দেখাবো, তারপর ওখান থেকে পুরী, দার্জিলিং আর শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাব। তাই না? কেঁদোনা প্লীজ কেঁদোনা তোমরা।

ইন্দ্র সীমার দিকে তাকালো। দেখলো সীমা খাবারটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু খাচ্ছে না। শুধু ওর চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে থালায়।

- কি হলো, খাও তুমি? বসে আছো কেন? আর বেশি সময় নেই। বড়ো জোর পনের মিনিট আর সময় আছে। তার মধ্যে বেরুতেই হবে আমাদের।

সীমা বেশ বিরক্ত চোখে তাকালো একবার ইন্দ্রের দিকে। সেই চোখে কান্না ছাড়াও ছিল বিরক্তি এবং হয়তো বা রাগও।

- আমার খিদে নেই। খেতে পারছি না। তুমি খেয়ে নাও।

- না না, খাবার নষ্ট করো না। আম্মা অনেক কষ্ট করে তৈরি করেছেন এসব। খেতে পারবে। খাও।

সীমা কোনো কথা না বলে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে হটাৎ আম্মাকে জড়িয়ে ধরে নীরবে কাঁদতে লাগলো। কান্নাটা এবার যেন আরো বেড়ে গেল।

- বেটী, কাঁদে না এমন করে। মেয়েদের তো নিজেদের ঘর ছেড়ে একদিন স্বামীর ঘরে চলে যেতেই হয়, তাই না? এতো কেঁদো না মা, এতো কাঁদলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আর কিছু একটু তো খেতেই হবে, মা। সেই কখন বাড়ি পৌঁছবে, তারপর রান্না বান্না করবে তারপর তো খেতে পাবে। চলো তো মা, আমি খাইয়ে দিই তোমায়।

সীমাকে প্রায় জোর করে চেয়ারে বসিয়ে আম্মা একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগলেন সীমাকে, আম্মার বাম হাতটা জড়িয়ে ধরে সীমা নীরবে কেঁদে যেতে লাগলো।

শহিদুল ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো, বললো - দাদা, গাড়ি এসে গেছে। আপনারা রেডি তো? ব্যাগগুলো আমি গাড়িতে তুলে দিচ্ছি তাহলে।

সীমা আর খেলো না, আম্মাকে থামিয়ে দিয়ে বললো –

-আমি সত্যিই আর পারছি না আম্মা, আর খাবো না।

আম্মা হাত ধুয়ে একবার ঘরে গেলেন। তারপর একটা কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসে সীমার হাতে দিয়ে বললেন –

- মা, কিছুই তো তোমায় দিতে পারলাম না। এতোদিন থাকলে, কিন্তু এ এমন সময় যে সব দোকান বন্ধ। আমি শামীমের শাদীর জন্য একটা শাড়ি পছন্দ করে কিনেছিলাম। এটা আমি আমার আরেক বেটীকে দিলাম।

তুমি এটা পোরো মা। পরে যখন আবার আসবে তোমরা - জানিনা, আমি তখন আর থাকবো কি না। যদি থাকি তখন আবার দেখা যাবে। কিন্তু এখন এটুকুই দিতে পারলাম মা। তুমি কিন্তু দুর্গাপুজোয় পরবে এই শাড়ীটা।

সীমার যেন সহ্য করার সমস্ত শক্তি একটু একটু করে চলে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ও বেশ কিছুক্ষণ থেকেই করছিল। কিন্তু আর পারলো না। বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো কান্নায় ভেঙে পড়লো সীমা। আম্মার কানের কাছে মুখ এনে প্রায় স্বগোতোক্তির মতো করে বলতে লাগলো –

- আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না আম্মা, কিছুতেই যাবো না। আমায় তুমি চলে যেতে বলো না আম্মা, আমি যাবো না।

- দূর পাগলি মেয়ে। আমায় ছেড়ে তোকে কে যেতে বলল? কিন্তু তুই এতো কাঁদলে আমি কি করে থাকি বলতো? কাল সারারাত আমি কেঁদেছি আর আল্লাকে বলেছি – এ কেমন বিচার তোমার আল্লা? এক মেয়েকে খুঁজে পেলাম এতো বছর পর, তাকে আবার ছেড়ে দিতে হবে? - কিন্তু কি করবো বল? কার পাপে আমাদের এই দেশ ভাগ হয়েছে, নিজেদের মানুষদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, আলাদা থাকতে হয়েছে, এর কি কোনো দরকার ছিল? বল তো মা? এই দেশটা ভাগাভাগি না হলে তো কোনো অসুবিধেই হত না তোদের এখানে থাকতে, তাই না বল? - নে মা, চোখ মোছ, যাবার সময় এরকম কাঁদতে নেই।

অসহিষ্ণু ইন্দ্রও বারবার ঘড়ি দেখতে থাকে।

- সীমা, এবার চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। চলো প্লীজ, আর দেরী করো না ।

দুধারে শামিম আর শাহীনও এসে দাঁড়ায় সীমা আর আম্মাকে ঘিরে। ওরাও সীমাকে শান্তনা দেবার চেষ্টা করে। এদিকে শহিদুল এইসময় ছুটতে ছুটতে একবার ঘরে ঢুকে তাড়া দিল। দাদা, আপনার রিপোর্টিং টাইম আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। চলুন এবার।

ইন্দ্র সীমার হাত ধরে প্রায় জোর করেই ঘর থেকে বেরোয়। চোখমুখ মুছে কাঁধে ব্যাগটা তুলে নিয়ে আম্মা, শামিম আর শাহীনের থেকে বিদায় নেয়।

গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে সীমা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল শাহীন, শামিম একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আর যে আম্মা নিজেকে অত্যন্ত সংযত করে রেখেছিলেন এতক্ষণ, তিনি মাটিতে বসে পড়ে অসহায়ের মতো চীৎকার করে কেঁদে চলেছেন।

মুহুর্তের মধ্যেই ঘটে গেল অঘটন। সীমা এক ছুটে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে আম্মাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিল। কান্নার মাঝে একেবারে আর্তনাদের মতো ও বলতে লাগলো –

- আমি ছোটবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি। সেভাবে মাকে দেখিও নি কোনোদিন। আজ আমি আর এই মাকে ছেড়ে যাবো না। কিছুতেই না, কিছুতেই যাব না আমি। তোমরা যা ব্যবস্থা করার করো। আমি কিছুতেই যাবো না। এটাই আমার আসল ঘর, আসল মা, আমার ভাইবোন। আমি কিছুতেই ফিরবো না এখান থেকে। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও। আমি যাব না। কিছুতেই আমি আমার এই মাকে ছেড়ে যাব না।

**** স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ !!***

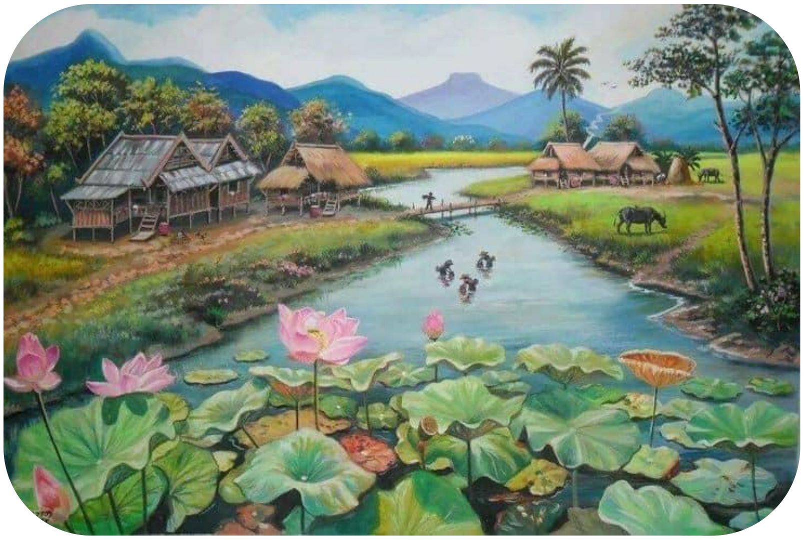

দ্বীপ

চৈতালি দত্ত

অনেকদিন বাদে রঞ্জাকে দেখলাম। অবশ্য কাজকর্মের চাপে এতদিন ব্যস্ত থাকায় এই রবীন্দ্রসদন চত্বরে আমার বিশেষ আসা-যাওয়া ছিল না। অবসরের পর হাতে অঢেল সময় - তাই এক বন্ধুর আমন্ত্রণে এদিকে আসা। রঞ্জা কিন্তু সাজসজ্জায় প্রায় একই রকম আছে। রঙিন সিনথেটিক শাড়ি , মুখে উগ্র মেক-আপ, কেবল বাড়তি বলতে শাড়ীর রঙের সঙ্গে ম্যাচিং মাস্ক।

- আরে, রঞ্জা না? এখানে কী করছিস?

- ওহ অরুন তুই!এখানে শিশির মঞ্চে চিত্র প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলাম।

- ওইসব অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বুঝতে পারিস কিছু?

- না।হ্যাঁ মানে অনেকক্ষন যদি স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকিস,ঠিক বুঝতে পারবি।

- দূর, এতো সময় নেই আমার।যাইহোক তুই রিট্যায়ার করেছিস? আমি করেছি গত আগস্টে।

- হ্যাঁ - আসলে জানিস তো স্কুলে ভর্তির সময় বড়দা ভুল করে তিন বছর বাড়িয়ে বলেছিল।তাই।নাহলে আমার তো আরও তিনবছর কাজ করার কথা।

- ওহো।সে যাই হোক ভালো আছিস তো ?

- হ্যাঁরে, ভালোই আছি।

- বাড়ি যাবি না? চল মেট্রো ধরি।

- নারে, আমি বাসেই যাব।

- আচ্ছা বেশ।ভালো থাকিস।

সেদিন কথাবার্তার এখানেই ইতি।কী কারণে সেদিন মেট্রোয় খুব গোলমাল।বিরক্তভাবে আবার বাইরে এলাম। আমার ভাগ্য প্রসন্ন সামনেই একটা প্রায় খালি সাটল বাস পেলাম।জানলার ধারের সীটে বসে রঞ্জার কথাই ভাবছিলাম।তখন আমরা ইউনিভার্সিটির শেষ ধাপে।কয়েকজন ইতিমধ্যেই চাকরি জোগাড় করে ফেলেছে। অনেকেই ঠিক করেছে ভাবী জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর।সেইসব দিনের একদিন -----

- কি রে রঞ্জা বিয়ে করবি না ?

- করব তো ! ঠিকঠাক পাত্র পেলেই করব।

- সেই যে সেদিন বলছিলি কোথাকার এক ইঞ্জিনিয়ার তোকে বিয়ে করার জন্য পাগল! তার কী হল?

- দেখ অতো হ্যাংলামি আমার ভাল লাগেনা।আরও ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে পেলে -

- অ।তাহলে তাই খোঁজ।

এর কয়েকবছর পরেও যখন আমি বিবাহিত এবং চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।তখন একদিন -

- কী রে রঞ্জা , চাকরি পেয়েছিস শুনলাম।

- হ্যাঁ ওই আলবার্ট মেমোরিয়াল স্কুলে। ....

- এতটা পড়াশোনা করে শেষে স্কুল টিচিংয়ে গেলি!

- না না, স্কুলে পড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।

- ঠিক আছে তাহলে।

আসলে আমরা সকলেই মোটামুটি আন্দাজ করতে পারতাম যে রঞ্জা সবসময়েই তার সত্যিকারের চেহারাটা লুকিয়ে রাখতে চায়।তার অসফলতা, ব্যর্থতা সে কখনোই প্রকাশ্যে আনবে না।সেইভাবে দেখতে গেলে আমাদের কারোকেই ও কখনও সত্যিকার বন্ধু বলে ভাবে না।কী আর করা যাবে।

আমার মনে হল রঞ্জা মেয়েটা (এখন যদিও ওকে 'মেয়ে' বলে উল্লেখ করাও হাস্যকর) সত্যি বড় দুঃখী, বড় একা- একটা নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ দ্বীপের মত শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে।নাঃ, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল। লিপি এমনিতেই চুপচাপ।ও কিছুই বলবে না শুধু মুখটা আরও থমথমে হয়ে থাকবে।আসলে বেচারী এতো ইন্ট্রোভার্ট যে ওর কষ্টের কথা আমার সঙ্গেও শেয়ার করতে পারেনা।ও নিশ্চিত বোঝে আয়ুষকে নিয়ে আমারও কম দুশ্চিন্তা নেই।একমাত্র সন্তান সুযোগ যখন এসেছিল তখন বিদেশ পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি।

কিন্তু দিনে দিনে আয়ুষ যেন পাল্টে যেতে লাগল।পড়াশুনার চেয়ে অন্য নানা আমোদ প্রমোদে বেশি আগ্রহ। ফলে টাকার চাহিদা বাড়ছিল যা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত।তখন পড়াশোনা বন্ধ করে সাধারণ চাকরি নিলো।বুক ভেঙে গেছে আমার, লিপিও তথৈবচ।কই এই নির্মম সত্য তো আমরা কাউকে বলতে পারিনি? আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, কাউকে না! নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ জনহীন দ্বীপের মোট একবুক ব্যাথা নিয়ে আমরা টিকে আছি।রঞ্জা রে, শুধু তুই নয়, আজ আমরা অনেকেই তোর ই মত নিঃসঙ্গ, দুঃখী।অস্তিত্ব দ্বীপের মত টিকিয়ে রাখছি।

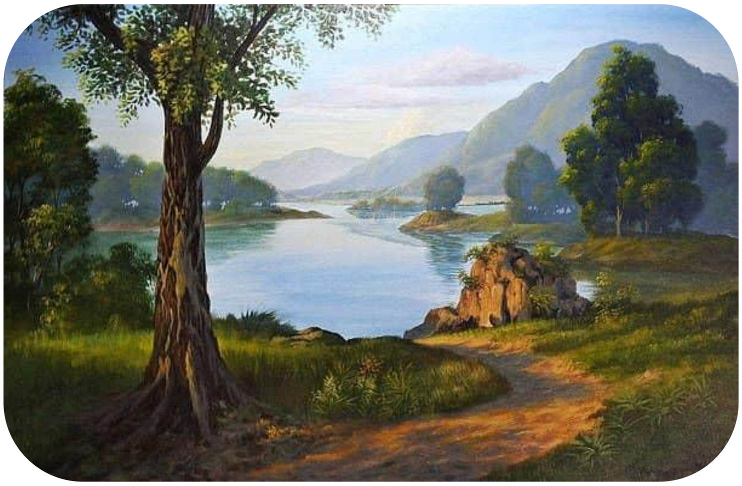

গগণবাবু এবং ভাপা ইলিশ

অশোক বিশ্বাস

সকালে গিন্নির দেওয়া গরম লাল চায়ে দু'চুমুক মেরে তড়িঘড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন গগণবাবু। রাস্তায় কেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি তখন বাজার ফেরতা। কেষ্টবাবু দুঁদে দারোগা ছিলেন। এখন রিটায়ার করে দুঁদে দারোয়ান হয়েছেন। তাঁর হেঁড়ে গলার চিৎকারে বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারেনা। এ হেন্ কেষ্টবাবু হাঁকলেন -- কি দাদা চললেন?

গরম চায়ের ওম তখন পেটের মধ্যে, কিঞ্চিৎ হেঁয়ালি করলেন গগণবাবু -- না, ফেরার ইচ্ছে আছে। হে হে করে কান এঁটো করা হাসি হেসে কেষ্টবাবু বললেন - না, না, আমি সে যাওয়ার কথা বলিনি। বলছিলাম বাজার চললেন কিনা। ঘাড় নাড়লেন গগণবাবু।

-- যান, ইলিশ আজ বেজায় সস্তা। একেবারে পদ্মার মাছ, আমদানিও অনেক।

খেয়াল করতে দেখা গেল দু'খানা ইলিশের ল্যাজ কেষ্টবাবুর বাজারের ব্যাগের কোণ দিয়ে উঁকি মারছে। মনে মনে হাসলেন গগণবাবু।ব্যাটা ঘটি বাঙালকে ইলিশ চেনাচ্ছে। তবে ইলিশ সস্তা শুনে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল।

বাজারে পৌঁছে গগণবাবু দেখলেন, আমদানি বেশি হলেও দামে তেমন সস্তা নয়। সাত-আটশো গ্রামের মাছগুলোই বারোশো টাকা হাঁকছে। চেনা মাছওয়ালার সাথে দরাদরি করে কেজিতে পঞ্চাশ টাকা কমানো গেল। মাছগুলো নামখানা - ডায়মন্ডের, পদ্মার নয়। আটশো গ্রামের একটা পছন্দ হল। চেনা মাছওয়ালা তাই পাঁচশো টাকা জমা রেখে মাছটা দিয়ে দিল। বাকিটা পরের দিন দিতে হবে এই কড়ারে মাছটা ব্যাগে ঢুকিয়ে গগণবাবুর মনে হল – না কিনলেও চলতো। কড়কড়ে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। খেয়াল হল কেষ্টবাবুর সস্তা আর তার সস্তা এক নয়। হেল এন্ড হেভেন ডিফারেন্স। নইলে এই বাজারে চার চারটে মেয়ে পার করার পরও কেষ্টর ইলিশ নাচাতে নাচাতে বাজার থেকে ফেরা চলতো না।

সকালবেলায় প্রায় আটশো টাকা গাঁট সেলামি দেওয়ার পর মনের কোনে কেমন যেন একটা সিগন্যাল টের পেতে শুরু করলেন গগণবাবু। তার মনে হচ্ছিল - আজ দিনটা বোধহয় গাঁট সেলামির। কিছু একটা চিত্তির হবে। হলো ও তাই। আটটার লোকাল ধরে এগারোটায় ট্রেন-বাসের পাবলিকের গুঁতো সামলে অফিসের চেয়ারে বসতে না বসতেই টেবিলের উপরঝপাং করে চার-পাঁচটা রেজিস্টার ও ফাইল এসে পড়ল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে গগণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন - কি ব্যাপার রে শান্তি ? শান্তি ওরফে শান্তিপদ মল্লিক বড় সাহেবের খাস বেয়ারা, চর ও বটে।

গম্ভীর গলায় শান্তি উত্তর দিল - বড় সাহেব আপনাকে ডেকেছেন। খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন গগণবাবু। কি হল কে জানে। বড় সাহেবের যা কুচুটে স্বভাব, সাত সকালে ডেকে পাঠানো মানে, ব্যাপারটা অন্যরকম কিছু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, শান্তির পিছু পিছু সাহেবের ঘরের সামনে এসে ভারী পর্দার এপারে মুহূর্তের জন্য থামলেন গগণ বাবু। আওয়াজ পেলেন সাহেব ফোনে কথা বলছেন। পর্দার কোণ থেকে চোখ গেল, দেখলেন বড় সাহেবের আর এক চর মিসেস ব্যানার্জি আছেন ঘরে। মিসেস ব্যানার্জি ঘরে থাকলে বড় সাহেবের মেজাজটা বেশ অন্যরকম থাকে। মাঝখানে হঠাৎ কেউ ঢুকে পড়লে সাহেব বিরক্ত হন। নিঃশব্দে কেটে পরে, মিনিট দশেক পরে আসার প্ল্যান করে পেছন ফিরতেই, শান্তি ধরল - কি হল,যান বড় সাহেব আপনাকে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলেছেন।

অগত্যা ভারী পর্দা সরিয়ে, দরজায় উঁকি মেরে গগণবাবু বললেন -- ভেতরে আসবো স্যার ?

- আসুন, আপনাকে তো অনেকক্ষন ডেকেছি। সাহেবের গলা বেশ ভারী। গুটি গুটি এগিয়ে সাহেবের সামনের চেয়ারে বসলেন গগণবাবু।

-- কতক্ষন এসেছেন অফিসে? জানতে চাইলেন বড় সাহেব।

- মিনিট পনেরো হল।

- শান্তি ফাইল রেজিস্টার দিয়ে এসেছে আপনার টেবিলে?

ঘাড় নাড়লেন গগণবাবু।

মুহূর্তের মধ্যে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন বড় সাহেব - আপনার মত ক্যালাস স্টাফের জন্য এই কোম্পানি একটা ভালো ক্লায়েন্ট হারাতে যাচ্ছিল, তা জানেন! সাম হাউ ম্যানেজ করা গেছে। বিপুলবাবুর কাছ থেকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিন গিয়ে। পুরো কাজটা আজ তুলে দিয়ে, তবে বাড়ি যাবেন।

ঘাড় নেড়ে চুপচাপ বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গগণবাবু।

আর এক মুহূর্ত দেরি করা মানে, আরো কিছু খারাপ কথা শোনা। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা কথা বারবার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকল - মিসেস ব্যানার্জির সামনে এতটা না বললেই পারতেন বড় সাহেব। মেয়েদের এমনিতেই ভীষণ পেট পাতলা। তার মানে টিফিনের আগেই অফিসময় চাউর হয়ে যাবে ব্যাপারটা। হলো ও তাই।

নতুন-পুরোনো একগাদা ফাইলের মধ্যে থেকে দরকারী রেকর্ডগুলো উদ্ধার করে গত দুবছরের মধ্যে কোন এক সময়ে নিজের অজান্তে হয়ে যাওয়া কয়েকটা ভুল শুধরে ফেলতে হবে। যাকে বলে পোকা বাছা কাজ। মধ্যে দুপুর একটা নাগাদ বড় সাহেব একবার তাগাদা করে গিয়েছেন।

শান্তিপদ ও মিসেস ব্যানার্জী ব্যাপারটা চাউর করে দিয়েছেন অফিসের বাকী সবাই এখন করুনার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। হাবেভাবে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব এনে কাজ চালিয়ে গেলেন গগণ বাবু। টিফিনের সময় ক্যান্টিনে যেতে আজ দেরী হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সবই শেষ। শুধু সকালের দু-একটা ভাজাভুজি পড়ে আছে। অগত্যা তাই কয়েকটা পেটে পুরতে হল।

কাজটা বাগে আনতে আনতে প্রায় সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। বড় সাহেব আর খোঁজ নেননি। হয়তো শান্তির মত চরদের মাধ্যমে খবর নিয়েছেন। পরদিন সকালে সাহেবের মেজাজ ঠান্ডা থাকলে তখন দেখা করা যাবে এইরকম ভেবে নিয়ে, ফাইল - রেজিস্টার গুলো আলমারিতে তুলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন গগণবাবু।

শিয়ালদামুখো বাসগুলোতে এখন বাদুড়ঝোলা অবস্থা। তবুও লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, বেঁকেচুরে যে করে হোক উঠতে হবে। তারপর শেয়ালদা থেকে আবার দুই-আড়াই ঘন্টার ট্রেন জার্নি। অবশেষে বাড়ী পৌঁছতে মিনিট কুড়ির হাঁটা পথ। সর্টকার্ট করলে পনেরো মিনিট। এ অভ্যাস ফেলে আসা ত্রিশ বছরের। আরো বছর দুয়েক চালিয়ে যেতে হবে।

শিয়ালদামুখো একটা বসে ঝাঁপিয়ে উঠতে হল। শিয়ালদায় পৌঁছতে আজ সাতটা বেজে গেল গগণবাবুর। রোজকার সাড়ে ছ'টার ট্রেন চলে গেছে। অগত্যা সাড়ে সাতটার বনগাঁ লোকাল। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী আজ আগেই ঢুকে গেছে। তাই সব সিট্ ভর্তি। ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ল আজ। ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে বারাসাতে সিট্ ছাড়ল একজন। বনগাঁ স্টেশনে এসে নামতে নামতে প্রায় রাত দশটা। ট্রেন থেকে নেমে গগণবাবু দেখলেন স্টেশন বাজারে লোডশেডিং। অন্য দিকেও হয়তো তাই। পুজোর মুখে লোডশেডিংয়ের বহর প্রত্যেকবার বেড়ে যায়।

ট্রেন থেকে নেমে খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠলো। এক ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে কিছুটা খিদে মেটালেন গগণ বাবু। সকালে গিন্নিকে ভাপা ইলিশের ফরমায়েশ করে এসেছিলেন। সেটা মনে পড়তেই বেশ একটা চনমনে ভাব এসে গেল। সময় বাঁচাতে স্টেশন বাজার পেরিয়ে এসে সর্টকার্ট করার জন্য বিশ্বকর্মা সিনেমার পেছনের গলি রাস্তাটা ধরলেন গগণ বাবু। এই গলিটা একটু নিরিবিলি হলেও গাড়িঘোড়ার ঝুট ঝামেলা নেই। তাই পাঁচ সাত মিনিট সময় বাঁচানো যায়। তাই কোনো কোনো দিন স্টেশনে যাওয়ার সময় বা ফেরার সময় এই গলিটা ব্যবহার করেন গগণবাবু। কিন্তু দিনটা আজ অন্যরকম। তাই গলির মাঝ বরাবর আসতেই উল্টোদিক থেকে আসা চারটে ছেলে চোখের উপর টর্চ মেরে একটু অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করল - কি কাকু, অফিস থেকে ফেরা হল বুঝি ? ছেলেগুলো অচেনা, হাবভাব অন্যরকম।

- সকালে আমাদের ছেলেরা পুজোর চাঁদাটা চাইল, দিলেন না যে বড়! এবার পুজো বড় করে হচ্ছে, তাই চাঁদা বেশি লাগবে।

আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা হল গগণবাবুর --- কই না তো! আজ তো কেউ চাঁদা চায়নি। গলার স্বরটা মিনমিনে হয়ে গেল তার।

- কেন চাইল যে। ষন্ডামার্কা একজন মুখের সামনে মুখ এনে বলল। তার মুখের মদের গন্ধ ভক করে নাকে এল। দু'পা পিছিয়ে গেলেন গগণবাবু। এলাকা সুবিধার নয়। আশেপাশে বাড়ি ঘর-দোর নেই। তাই ঠিক করলেন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ছেলেগুলোর মধ্যে একজন টিপ্পুনি কাটলো - ট্রেনের প্যাসেঞ্জারগুলো শালা হাড় –কেপ্পন হয়। একজন হুঙ্কার দিল - শোনো কাকু আমরা সোজাসুজি হিসাব বুঝে নেব। এখনই নগদ কারবার করে ফেলো। আশেপাশে একবার তাকালেন গগণ বাবু। কাছাকাছি কেউ নেই। তার মানে এদের হাত থেকে রেহাই নেই। তাই একটা ফয়সালা করার জন্য বললেন - চাঁদা কত দিতে হবে ?

- কত আছে? এক ষন্ডামার্কা পাল্টা প্রশ্ন করল।

আমতা আমতা করলেন গগণবাবু -- শ'দুয়েক দিতে পারবো।

চারজন ই হেসে উঠল। একজন বলল - দুশো টাকায় কি আর মায়ের পুজো হয়। হাজার হাজার টাকা লাগে। মিনিমাম হাজার দু'য়েক দিয়ে যাও।

- অত কোথায় পাবো? কথার মধ্যে সাহস ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন গগণবাবু। কিন্তু হল না, গলা কেঁপে গেল।

এবার আর একজন ষন্ডামার্কা এগিয়ে এল -- হাতে ছোট একটা ক্ষুর। সে বলল - শোনো কাকু ঘড়িটা দিয়ে যাও. ওটাই ভাল হবে।

- তা কি করে হয়। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন গগণবাবু। সঙ্গে সঙ্গে একটা বজ্রমুষ্টি জামার কলার চেপে ধরল। তারপরেই ফ্যাস করে একটা আওয়াজ হল। পুরোনো জামাটা ছিঁড়ল। অন্য একজন দ্রুত হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিলো, পকেটের টাকাগুলো ও নিয়ে নিল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে পাশের মাঠ পেরিয়ে অন্যদিকে উধাও হয়ে গেল। অথর্বের মত অন্ধকারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন গগণবাবু।

বাড়ী ফিরে ঘটনাটা চাউর হতেই ছেলে-মেয়ে বউ সবাই একেবারে রে রে করে ছুটে এল। জামাটা খুলতেই নজরে এল কলারের নিচে একেবারে হাঁ। জামাটা পুরোনো ছিল। তবে আরো কিছুদিন পরা চলতো হয়তো।

জামা, ঘড়ি ও টাকাপয়সার শোকে বাড়ীর সবাই একেবারে উদ্বেল হয়ে পড়লো। গগণবাবুর পেটটা যে ক্ষুরের খোঁচায় ধসে যেতে পারতো সে সম্ভাবনাটা কেউ খতিয়ে দেখল না। গিন্নি-ছেলে-মেয়ে দুটো যে যার মত চালিয়ে গেল। গগণবাবু নীরব শ্রোতা হয়ে রইলেন। নানাজনের নানা মত। একটা ব্যাপারে সকলে একমত হল, পুজোর মরসুমে কেবলমাত্র বোকারাই সর্টকার্ট করার জন্য ঐ গলিটা ব্যবহার করে।

ঘন্টাখানেক পর ছিনতাইয়ের জন্য প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াজনিত ঝামেলা কাটিয়ে ওঠার পর একটু নিরিবিলি হতেই গিন্নির অকারণ মন্তব্য কানে এল -- আজ সারাদিন কি ভাবের ঘরে আছো? সকালে হুট করে অতবড় একটা ইলিশ এনে ফেললে। মাসের শেষ খেয়াল থাকে না ! তারপর আবার ভাপা ইলিশের ফরমায়েশ হল। তোমার ইলিশের সর্ষে বাটতে গিয়ে আমার গতর ব্যাথা হয়ে গেছে। তারপর অফিস থেকে ফেরার পথে ঘড়ি, টাকা-পয়সা সব দিয়ে এলে।

- দিয়ে এলে মানে ? হোয়াট ডু ইউ মিন ? গগণবাবু পাল্টা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাগলে বাঙালির মুখ দিয়ে ইংরেজি বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ইংরেজী শুনে গিন্নি চড়ে গেলেন। হয়তো ক্লাস এইটের বিদ্যায় অতবড় ইংরেজী হজম হল না। ঠোকাঠুকি চলল কিছুক্ষন।

যথারীতি সাড়ে দশটা নাগাদ ছেলের মারফত ভাত খেয়ে আসার অনুরোধ এল। এপাশ থেকে বকলমে উত্তর গেল - খিদে নেই। খবরটা রান্নাঘরে পৌঁছতেই ঠনঠন করে থালাবাসনের পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। তার মানে ভাত, মাছের বাটি, তরকারি সব নর্দমার মুখে উপুড় হল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করলেন গগণবাবু।

এখন রাত বারোটা। এগারোটা নাগাদ খালি পেটে শুয়ে পড়েছিলেন গগণবাবু। পেটে খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে। টর্চ জ্বালিয়ে বিছানা থেকে উঠলেন। জল খাওয়ার ছুতো করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন - খাবার দাবার সব নর্দমার মুখে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলেন ভাপা ইলিশও হয়েছিল। তার চিহ্নও রয়েছে, শুধু মাছগুলো উধাও।

ফিরে এসে শোয়ার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরালেন গগণবাবু। সুখটান দিয়ে মশারি উঠিয়ে বিছানায় ফিরতেই হাতে নরম স্পর্শ পাওয়া গেল। খেয়াল করে বুঝলেন গিন্নির মেনি বেড়ালটা শুয়ে আছে। আজ গিন্নি রাগ দেখিয়ে মাটিতে বিছানা করে শুয়েছেন। বিছানায় ফাঁকা জায়গা পেয়ে বিড়ালটা তার জায়গা নিয়েছে। আর যার সঙ্গে গত ত্রিশ বছরের সম্পর্ক তিনি এখন ভূতলশায়িনী। তারও নিশ্চয় আজ খাওয়া হয়নি। মেনি বেড়ালটার আজ পৌষমাস। এ ব্যাটাই রান্নাঘরে ফেলা মাছগুলো নিশ্চয়ই সাবড়েছে। ব্যাটা জীবনে এমন ভোজ খায়নি কখনো নিশ্চয়ই।

!! প্রবন্ধ !!

আনন্দময়ীর আগমনবার্তা

উৎপলা পার্থসারথী

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জরী ।আকাশে শুভ্রমেঘমল্লার আর ধরিত্রীর বুকে শিউলি কাশফুলের মেলা উৎসবের আগমনবার্তা বহন করে।জোতির্ময়ী জগ্নমাতার আগমন, চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী রূপে আবাহনের সুচনা। বাঙালীর প্রানের মনিকোঠায় কে এই চিন্ময়ী?

বাঙালির দুর্গাপূজার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল,দেবী দুর্গার মতো শক্তিময়ী, অস্ত্রধারী ও জগদ্ধাত্রী দেবীকে কন্যারূপে ও মাতৃরূপে কল্পনা করা।দুর্গা যেন তার একান্ত ঘরের মেয়েটি যে শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। আসুরিক শক্তির সংহারক ও রণচন্ডী ''দুর্গা এবং দুর্গাপূজা" সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে বাংলার শাক্তপদাবলীকে।কবিরঞ্জন শ্রীরামপ্রসাদ সেন শাক্তপদাবলী সাহিত্যে এক নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছিলেন। বীর রসের শাক্তপদাবলীতে তিনি বাৎসল্যরসের সঞ্চার করেছিলেন।ফলে মহামায়া হয়ে উঠেছেন কন্যার মতো, ঘরের মেয়ের মতো। এইভাবেই আগমনী সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে।আগমনী গানের বিষয়বস্তু উমার পিত্রালয়ে আগমন ও তৎসংক্রান্ত ঘটনা পরম্পরাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উমার পিতৃগৃহে আগমণ নিয়ে আগমনী ও কৈলাসে গমন নিয়ে বিজয়া গান রচিত হয়েছে।

দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে শিব বহুকাল একাকী ছিলেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের গৃহে সতী উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন । পরে কঠোর তপস্যা করে শিবের অটল প্রতিজ্ঞাকে টলিয়ে তিনি শিবকে পতি রূপে বরণ করেন। এই উমা পর্বতকন্যা,তাই পার্বতী। এসবই পৌরাণিক আখ্যান। লোককল্পে,দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গা আর উমা এক হয়ে গেছেন। শিব-পার্বতীর বিবাহ হল ধুমধাম করে। বিয়ের দিন বুড়ো শিবকে দেখে পাড়া-প্রতিবেশী শাশুড়িকে বলে, "মেনকা মাথায় দিলো ঘোমটা!" 'ভাঙর ভিখারি জামাই' দেখে মেনকা চেতনা হারান।পরে শিব মদনমোহন রূপ ধরলে পার্বতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বাংলা লোকসংগীতে ও বারাণসী ঘরানায় শিব বিবাহের বহু গান রচিত হয়েছেও গীত হয়।এখন, বিয়ে তো হল, কিন্তু জামাইয়ের অমন ভোলা আশুতোষ রূপ দেখে কন্যার মা কি ঠিক থাকতে পারেন!

মেয়ের সাংসারিক দুর্দশার কথা চিন্তা করে মা মেনকা মরমে মরে রইলেন।

মাতৃহৃদয় দেবত্ব মানেনা, মহাশক্তি তাই মায়ের কাছে সাধারণ উমা। কোনমতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করার পর শারদ রাণীর আগমন বার্তা পেয়ে ,ধরিত্রীর শুভ্র সুন্দর রূপ দেখে মা মেনকার মন আবার কন্যা বিরহে কেঁদে উঠল । তার মাতৃহৃদয় গিরিরাজকে বলতে শোনা যায় 'যাও যাও গিরি আনিতে, গৌরী উমা নাকি বড় কেঁদেছে, 'দেকেছি স্বপন নারদ বচন উমা মা মা বলে কেঁদেছে' ।

গ্রামবাংলার কবি কল্পনার মধ্যে আরো একটি মজার দিক হলো তারা উমার স্বামীকে একেবারে অপদার্থ নির্গুন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করব।অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্র তা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

'পিতামহ দিলা মোর অন্নপূর্ণা নাম, অনেকের পতিতেই পতি মোর বাম

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধি তে নিপুন, কোন গুণ নাই যার কপালে আগুন,

কুকথায় পঞ্চমুখ কন্ঠ ভরা বিষ, কেবল এই আমর সঙ্গে দন্ড অহর্নিশ,

গঙ্গা নামে সতী তার তরঙ্গ এমনি জীবন স্বরুপা তিনি স্বামী শিরমনি'।

(যদিও সাধারণ ভাবে শুনলে এটাকে গালাগালি বলে মনে হয় আসলে কিন্তু এটা শিবের গুণ গান। যেমন

শিব কে আমরা জগতপতি বলে মনে করি, তিনি জগতের আদি, ত্রিনয়নে তার আগুন, কন্ঠে তিনি বিষ

পান করেছেন যাবতীয়॥)

মা মেনকা সারাবছর অপেক্ষা করেন এ হেন জামাই এর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে উমা কবে দুদিনের জন্য মা এর কোলে এসে একটু জিরোবে। তাই উৎসব ঋতু শরতের প্রারম্ভেই গিরিরাজের কাছে আকুল অনুরোধ জানান 'তিনি গিরিকে অনুযোগ করে বলেন, "গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে, কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে। কামিনী করিল বিধি, তেঁই হেতো মারে সাধি, নারীর জনমকে বল যন্ত্রণা সহিতে!" (কমলাকান্ত)

(মেয়ের বিয়ে দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ তোমার? মেয়ে আমার ঐ উলঙ্গ শিবের হাতে বাঁচল না মরল, একবার ও খোঁজটুকু নিতে নেই! বিধি আমায় নারী করেছে, আমার শুধু তোমার হাতে-পায়ে সাধাই কাজ, তাইনা! নারী জন্মই তো কেবল যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য) –এই চিরন্তন শ্লেষ, বাংলার ঘরে ঘরে কান পাতলেই এমন শোনা যায়।

আরও বলল মেনকা,

"সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,

তুমি হে পাষাণ, তা হেনা কর মনেতে।

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,

কেমনে সহিব এত মায়ের প্রাণেতে।।" (কমলাকান্ত)

সতীনের ঘর করে উমা।সতীন মানে গঙ্গা।সে মোটেই সরলা নয়; স্বাভাবিক, নদী কখন ও সরল গতিতে চলতে পারে! একে সতীনের ঘর, তায় আবার স্বামী শ্মশানচারী। তুমি তো পাষাণ, কেমন করে বুঝবে এ সব? হিমালয় তো 'পাষাণ'-ই হবে! কমলাকান্ত বলছে, হে পর্বতশ্রেষ্ঠ, মায়ের প্রাণে কেমন করে এ সব সয়। তাই এখন কী কর্তব্য–যাও গিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে এসো।

উপরের কবিতাগুলো পড়লে বোঝা যায় কবি কমলাকান্ত এত সুন্দর করে মহাদেব মহাদেবীর দেবত্বকে সাধারণ মানুষের সাধারণ সংসার এর মানব মানবীর দুখের সংসার এর মধ্য দিয়ে বিবৃতি করেছেন যেন সবার মনের কথা। এতো গেল মেনকার কথা। অন্যদিকে শিবের ঘরে অন্য পরিবেশ তখন।ভিখারি হলে ও ভালো তো

বাসে শিব প্রাণের চেয়ে ও বেশি পার্বতীকে। একবার যাকে হারিয়েছে, তা কে কি আর হাতছাড়া করতে চায়? তাই সেখানেও চলছে সাধাসাধি–

“তোমারি কারণে কঠিন পরাণে সম্বৎসর ভুলে আছি হে মায়েরে,

যাব পিতৃঘর শুন প্রাণেশ্বর অনুমতি কর দিন ত্রয় তরে।” (স্বামী তপানন্দ)

মাত্র তিনদিনের তো ব্যাপার, তারপরেই ফিরে আসব। এই কথা দিয়ে উমা চার ছেলেমেয়ে আর জয়া-বিজয়া দুই সখী কে নিয়ে রওনা হয় মর্ত্যের উদ্দেশ্যে। হর গৃহে নেমে আসে আঁধার, মর্ত্যে বেজে ওঠে ঢাকের বোল।

বাড়িতে ঢুকলেই যেমন ছেলেমেয়েরা আগে ‘মা কোথায়’ বলে হাঁক পাড়ে, উমাও তো তার ব্যতিক্রম নহেন! কিন্তু এ কী! মায়ের এই দশভুজারূপ দেখে তার আদরের ছোট্ট উমাকে চিনতেই পারেন না! আদরের মেয়ে, যাকে জল গড়িয়ে খেতে হত না, সে যদি সংসারী হয়ে যায়, তখন মা অবাক হয়ে যান, মেলাতে পারেন না। তাই, মেনকা কে বলতে শোনা যায় ,

“কোহি ও গিরি আনিলে হে কারে, কৈ গিরি মম নন্দিনী,

আমার অম্বিকা দ্বিভুজ বালিকা, এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী।” (তারাচাঁদ)

মেয়ে বাপের বাড়ি এসে একটু ধাতস্থ হলে মা ধীরেসুস্থে শ্বশুরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে, এমন টাই দস্তুর।

“কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।

কত লোকে কতই বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।।

মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই না কি ভিক্ষা করে।

এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই।।

চিতাভস্ম মাখে অঙ্গে জামাই ফেরে নানা রঙ্গে।

তুই নাকি মা তাঁরই সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই।।” (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে একদিকে যেমন মা মেনকার মাতৃহৃদয় উদঘাটিত হয়েছে তেমনি এই পদগুলিতে তৎকালীন বাঙালী জীবনের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে ।এবিষয়ে শশিভুষণ দাস বলেছেন ‘আগমনী বিজয়ার রচয়িতা কবিগণ মোটামুটি ভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ফলে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত এর মধ্য দিয়ে ঐ সমাজ এর ছবি ফুটে উঠেছে ।

তারপর উমা আসতেই সারা জগত আনন্দে মেতে ওঠে। আকাশে বাতাসে উৎসবের সাজসাজ রব নানারকম আচার উপাচারে মেয়েকে বরন করার আকুলতা। উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালী তাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে এই তিনটি দিন আনন্দের সাগরে ভাসতে থাকে। বিশ্বের যেকোনো অংশের যেকোনো বাঙালি যতই ব্যস্ত থাকুক, এই তিনটি দিন তাদের জীবনে ও একটি বিশেষ মূল্য বয়ে আনে! দেখতে দেখতে বিজয়াদশমীর দিন চলে আসে সবার মনেই এক আকুলতা ‘নবমী নিশি গো তুমি পোহায় না’ ।

প্রকৃতির নিয়মে রাত্রি প্রভাত হয় আর মা মেনকার মন কন্যা বিচ্ছেদ বেদনায় কেঁদে ওঠে। তাকে বলতে শোনা যায় -

“গৌরীরে লয়ে যায় হর আসিয়ে,

কি কবে গো গিরিবর রঙ দেখ বসিয়ে

বিনয় বচনে কত বুঝলাম নানা মতে,

শুনিয়া না শুনে কানে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে”

এই পদগুলি সাধন তত্ব হলেও যেকোনো পাঠককে আকৃষ্ট করে।তাই শাক্তপদাবলীর এই পদগুলি সামাজিক জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে, যথাযথ মানব সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের যুগযন্ত্রণা, হতাশা, নৈরাশ্য এবং তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাহস ও প্রতিরোধ এর ভাবনা ।

অন্যদিকে আবার, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যেখানে কোমল, ক্ষমতাহীন, সেখানে ‘শক্তি-রূপেনসংস্থিতা’ দেবী দুর্গার মহিষাসুর-মর্দিনী প্রতিমা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী-নেতৃত্বের কথা। তখন মনে পরে বৈদিকমন্ত্র-“নমঃস্তেশ্বরণ্যে শিবেসানুকম্পে; ,নমস্তে জগত ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।“

দেবী দুর্গা, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গের দেবতা কুলকে রক্ষা করেছিলেন তাই দেবীর মহিমার শেষ নেই।এহেন দেবীর কাছে তাই দুর্বল মানুষের চাহিদার শেষ নেই, তাই মানুষ প্রার্থনা করে “রূপংদেহি জয়ংদেহি যশদেহি. দিশজয়ী” ।

এহেন দেবী যাকে শান্তি,শক্তি, ও করুনার আধাররূপে স্মরণ করা হয়।যাকে নিয়ে বেদ পুরানে নানারকম শ্লোক রচনা করে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে। আসুন আজ আমরা সবাই মিলে তার কাছে এই দুর্যোগের দিনে শারীরীক সুস্থতা ও মানসিক নিরাময়তার প্রার্থনা করি। “যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তি রূপেনসংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমো ...”

'মহিষাসুরমর্দিনী' নিয়ে কিছু কথা

দেবাঞ্জন সুর

আমাদের কাছে, মানে বাঙালি হিন্দুদের কাছে দুর্গাপুজো উৎসব শুরু হয়ে যায় মহালয়ার ভোর থেকেই যখন রেডিও মারফত আমাদের কানে এসে পৌঁছয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে " আশ্বিনের শারদপ্রাতে ...." " মহিষাসুরমর্দিনী" র সম্প্রচারের মাধ্যমে। ভাবতে অবাক লাগে , বীরেন্দ্রকৃষ্ণ - বাণীকুমার - পঙ্কজকুমার মল্লিক এই ত্রয়ীর সৃষ্ট বেতার অনুষ্ঠানটি সারা বিশ্বের আপামর বাঙালির কাছে আজও একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়ে আছে , সেই ১৯৩৬ সালের শুরুর দিন থেকে। প্রায় নয় দশক ধরে একটি বেতার অনুষ্ঠানের এইরকম তুমুল জনপ্রিয়তা বজায় রাখার উদাহরণ সারা বিশ্বে আর একটিও আছে কিনা, আমার জানা নেই। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই বীরেনবাবুর অননুকরণীয় কণ্ঠে ভাষ্য ও স্তোত্রপাঠ।

বীরেনবাবুর একমাত্র পুত্র প্রয়াত প্রদ্যোতকুমার ভদ্র ছিলেন আমার ভগ্নিপতি, আমার প্রদ্যোতদা। "মহিষাসুরমর্দিনী " ও বীরেনবাবুকে নিয়ে যেসব কথা প্রদ্যোতদার কাছে শুনেছি, সেগুলিই এখানে পরিবেশন করলাম।

তখনও টেপরেকর্ডার এর যুগ আসেনি। "মহিষাসুরমর্দিনী" সরাসরি সম্প্রচারিত হত, লাইভ ব্রডকাস্ট। বীরেনবাবু সন্ধেবেলায় রাতের খাওয়া সেরে একটা শতরঞ্জি ও একটা ছোট মাথার বালিশ, কাচানো ধুতি -পাঞ্জাবি পোঁটলায় পুরে ট্রামে চেপে সিধে চলে যেতেন গার্স্টিন প্লেসের আদি রেডিও অফিস ও পরবর্তী কালে ইডেন গার্ডেনে আকাশবাণী ভবন। অনেকে বলেন যে, বীরেনবাবু গঙ্গায় স্নান সেরে অনুষ্ঠানে এসে বসতেন। এটা একেবারেই ভুল তথ্য। ওনাকে কোনোদিন পুজোআচ্চা করতে দেখা যায়নি, গঙ্গাস্নান তো দূরের কথা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকে একেবারে চুপ থাকতেন এবং সংগীত শিল্পীদেরও কথা না বলে মনঃসংযোগ করতে বলতেন।

প্রদ্যোতদা বলতেন ছোটবেলার এক উৎকন্ঠার কথা - " আমার কেবলই ভয় হত, বাবা বলতে বলতে যদি কোথাও আটকে যান। যদি গলা চিরে যায় কিংবা কাশির দমকে স্বর না বেরোয়। তাহলে তো অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটবে। একবার মহালয়ার আগে বাবার প্রচন্ড ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল। ডাক্তাররা ওনাকে অনুষ্ঠান না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাবার নিজের মনেও সংশয় ছিল। তবে প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং ওষুধের ওপর ভরসা করে বাবা পাঠ সম্পূর্ণ করেন কিছুমাত্র কাটছাঁট না করে।

সময়টা ১৯৭৬ সাল। বেতার কতৃপক্ষ মনে করলেন "মহিষাসুরমর্দিনী " র বিজয়া দশমী পালন আশু কর্তব্য। তৈরি করা হল আনকোরা নতুন অনুষ্ঠান। বীরেনবাবু তো বাদ গেলেনই , বাণীকুমার ও পঙ্কজবাবুও রেহাই পেলেন না। যাকে বলে ঢাকি সমেত প্রতিমা বিসর্জন। নতুন অনুষ্ঠানে গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ও ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী-র মতো বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতজনকে যেমন যুক্ত করা হল, তেমনই উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং লতা মঙ্গেশকরের মতো জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে গ্ল্যামারের কোনও খামতি রাখা হল না। তাবৎ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ অত্যন্ত গোপনে করা হয়েছিল।বীরেনবাবুর কাছে কোনও পরামর্শ বা উপদেশ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। উনি ঘটনাটা জেনেছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।কতৃপক্ষের ওই লুকোচুরি তাঁকে সবচেয়ে বেশী আহত করেছিল।জনসাধারণ যে নতুন প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেননি, সে কথা আজ সকলেরই জানা।জনতার

প্রতিক্রিয়া এতই তপ্ত ও তীব্র হয়ে ওঠে যে বেতার কতৃপক্ষ ওই বছরেই মহাষষ্ঠীর সকালে পুরোনো "মহিষাসুরমর্দিনী" সম্প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।সেই থেকে এখনও "মহিষাসুরমর্দিনী" অমলিন, অক্ষত, অব্যাহত।

একটি অনুষ্ঠানের প্রায় নয় দশকব্যাপী ধারাবাহিক জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি কী?কোন টানে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের এক বৃহদংশ থেকে গ্রামবাংলার নিরক্ষর চাষিভুষো পর্যন্ত বিমোহিত?অবশ্যই ভক্তির প্রাবল্য নয়। চন্ডীর নামেই যদি ভক্তি উথলে উঠত, তাহলে রেডিওর নয়া উদ্যোগ প্রত্যাখ্যাত হত না।গ্রন্থনায় ব্যবহৃত সংস্কৃত স্তোত্র, এমনকি অনেকাংশে বাংলা ভাষ্য ও আদৌ সর্বজনবোধ্য নয়।বরং অধিকাংশের কাছে দুর্বোধ্য। তবু কেন ফিরে ফিরে শোনা? আমার ধারণা, এর মূল কারণ "মহিষাসুরমর্দিনী" উপাখ্যানের উত্তেজক নাট্যরস,যা বীরেনবাবু তাঁর কন্ঠের অনায়াস আবর্তন এবং আবেগের অবাধ উৎসরণ ঘটিয়ে শ্রোতৃচিত্তে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।তাঁর সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ কতখানি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা পণ্ডিতগণের বিচার্য হতে পারে। কিন্তু সাধারণের কাছে অপ্রাসঙ্গিক।নাট্যরস ছাড়া "মহিষাসুরমর্দিনী"র আর এক অমোঘ আকর্ষণ কিছু রাগাশ্রয়ী গানের অনুপম সুরমাধুর্য।যেগুলোর স্রষ্টা হলেন হরিশ্চন্দ্র বালী ও পঙ্কজবাবু।

এখন আর প্রতিবছর মহালয়ার ভোরের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। ক্যাসেট বা সিডি চালালেই শোনা যাবে যখন তখন। যে কোনো উপলক্ষ্যে শীতল পুজো থেকে অন্নপ্রাশন যখন খুশি।১৯৬৩ সাল থেকে টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা "মহিষাসুরমর্দিনী"র সম্প্রচার শুরু হয়।প্রদ্যোতদা দেখতেন, বীরেনবাবু সেটা শুনছেন নিজের ঘরে বসে, একা একা, এবং স্তোত্রপাঠের একটি বিশেষ অংশে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে , যেমন পড়ত লাইভ ব্রডকাস্টের সময়।

বিশ্বযুদ্ধকালীন দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে সিঙ্কোনা চাষের ইতিবৃত্ত

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাথীবৃন্দ

ম্যালেরিয়া এবং সিঙ্কোনা :

পাক বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মানবজাতি ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিষেধক হিসাবে কুইনাইনের ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত ছিল না।সেই সময় যুদ্ধে শত্রুদের অস্ত্রাঘাতের তুলনায় বেশি সংখ্যক সেনার মৃত্যু ঘটত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে। পরবর্তীকালে যখন গোলা-বারুদ, কার্তুজের আবিষ্কার হয় তখনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সৈন্যের বেশি মৃত্যু হত। কিন্তু সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকার আদিম উপজাতিরা এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার জানত।

দক্ষিণ আমেরিকায় সিঙ্কোনার বীজ সংগ্রহ :

১৮৫২ সালে হল্যান্ডের উপনিবেশ মন্ত্রী সরকারকে প্রস্তাব দেন যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিঙ্কোনার বীজ ও উদ্ভিদ সংগ্রহের জন্য সাউথ আমেরিকাতে পাঠানো উচিত। তদনুসারে, জাভার বিটি উজোর্জের একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্ভিদবিদ M.Hasskari বেশ কিছু সংখ্যক গাছ সঙ্গে নিয়ে ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে উপকূলে ফিরে আসেন। সেখানকার বন্যা অঞ্চল এবং স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে Hasskari -এর কোন ধারণা ছিলনা। তার উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে মূলত *calisaya* -র বীজ সংগ্রহ করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি calisaya বা অন্য কোন উন্নত প্রজাতির সিঙ্কোনা তিনি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। যদিও তিনি সেখান থেকে যে বীজগুলি সংগ্রহ করেন তার মধ্যে একটিকে প্রকৃত calisaya হিসাবে কল্পনা করেন। এই বীজগুলির একটি অংশ তিনি ডাকযোগে হল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তাদের মধ্যে কিছু অংকুরিত হয়েছিল এবং বাকি অংশ তিনি সরাসরি জাভায় পাঠিয়েছিলেন।তার ভ্রমণের সময় M.Hasskari শেষ পর্যন্ত একটি *calisaya* অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে তিনি অল্প সময়ের জন্য ছিলেন, কিন্তু সেখানে থাকাকালীন তিনি একজন স্থানীয় সংগ্রাহক তাকে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি আসলেই প্রকৃত calisaya সংগ্রহ করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মূল্যহীন প্রজাতিই সংগ্রহ করছিলেন। M.Hasskari-কে সিঙ্কোনা সংগ্রাহকের কাজে নিযুক্ত করার আগেই ডাঃ ওয়েডেলের দ্বারা প্যারিসে আনা কিছু বীজ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রকৃত *calisaya* প্রজাতি প্যারিসের Jardin des Plantes থেকে জাভায় পাঠানো হয়েছিল সুতরাং এইভাবেই প্যারিস থেকে প্রাপ্ত একটি উন্নতমানের সিঙ্কোনা, M.Hasskari-এর দ্বারা সংগৃহিত অনেকগুলি সংশয়জনক প্রজাতি এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রেরিত কিছু *lancifolia* প্রজাতির বীজ নিয়ে ডাচদের গবেষণা শুরু হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক সূচনার পর সিঙ্কোনা চাষে বেশ কিছু ত্রুটি দেখা দেয়, এর মধ্যে বাঁশের পৃথক পাত্রে একক বীজ বপনের পদ্ধতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, খোলা জমিতে সিঙ্কোনার চাষ না করে জাভার দৈত্যাকার বৃক্ষের ছায়ার চাষ করা এবং সর্বোপরি M.Hasskari-এর দ্বারা পেরু থেকে আনা অনুন্নত প্রজাতিগুলির চাষ করা(এবং পরবর্তীকালে এগুলিকে Pahudiana নামকরণ করা হয়). ১৮৬০ সালের শেষ পর্যন্ত জাভা প্লান্টেশনে প্রায় এক মিলিয়ন *Pahudiana* প্রজাতি এবং ৭০০০ টি *calisaya* প্রজাতি ছিল। ১৮৬২ সালে *Pahudiana* -এর অকৃতকার্যকারিতাকে আবিষ্কার করার পর এর চাষ বন্ধ হয়। তারা ১৮৬৪ সালে বনের ছায়ায় সিঙ্কোনা চাষের পরিকল্পনাকেও

প্রত্যাহার করেন। পরবর্তীকালে তারা অনবরত ভারত এবং সেইলন থেকে উৎকৃষ্ট মানের আলকোলয়েড যুক্ত উদ্ভিদ ও বীজের সরবরাহ পেয়েছে এবং শেষের দিকে তারা দুর্দান্ত সাফল্য পায়।

ভারতে সিঙ্কোনার চাষ :

ভারতে প্রথম পরীক্ষামূলক চাষের জন্য নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলের পঞ্চাশ একর জমি উপযুক্ত মানা হয়। তৎকালীন মাদ্রাজের বন সংরক্ষক Dr. Cleghorn এবং ওটাকামুন্ডের সরকারি বাগানের সুপারিটেন্ডেন্ট Mr. McIvor এর সুপারিশে Mr. Markham এর তত্বাবধানে *'calisaya'* গাছের চারা ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সুরক্ষিতভাবে সেই গাছের চারা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছনো হয়েছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে লোহিত সাগর হয়ে মুম্বাইয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে সেই গাছের চারাগুলি বেশ কিছুদিন মুম্বাইয়ে রাখা হয়েছিল এবং অক্টোবর মাসে চারাগুলি নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছনো হয় মৃতপ্রায় অবস্থায়। Mr. Pritchett এই মৃতপ্রায় গাছগুলি থেকে কলম তৈরি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। Mr. Cross, *Cinchona Succirubra* এর কলম সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে ১৮৬২ সালে কিউ থেকে ৬টি *Cinchona Calisaya* এর প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেখান থেকে একটি জীবন্ত সিঙ্কোনা গাছ Mr. Markham দ্বারা সংগৃহিত হয়েছিল। এই অভিযানের মাধ্যমে সিঙ্কোনা গাছ ঠিকঠাক ভাবে ভারতে পৌঁছেছিল। Mr. Cross ১৮৬১ সালের ৯ই এপ্রিল ওটাকামুন্ডে র কাছে সিঙ্কোনা গাছগুলি হস্তান্তরিত করেন।

সেই সময়ে তিনটি অভিযানের দ্বারা সংগৃহিত সিঙ্কোনার বীজ তাঁর সংগৃহিত গাছের গুনাগুনের তুলনায় আরও উন্নততর ছিল। প্রথমে বীজগুলিকে কিউ এর রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাঠানো হয় এবং সেখানে বপন করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা কিছু সিঙ্কোনা গাছ কিউতে ও রাখা হয়েছিল এবং সেখানে একধরণের আপদকালীন রিজার্ভ ব্যাংক তৈরি করা হয়েছিল যাতে যদি এটি কোন কারণে ব্যর্থ হয় তার বিকল্প হিসেবে অতি সহজে সেই রিজার্ভ ব্যাংক থেকে গাছগুলি পেতে পারেন। ভারত এবং অন্যান্য ব্রিটিশ অনুগৃহীত সফলতার সঙ্গে বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ Sir Willium Hooker ও Dr.Joseph Hooker কে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নাম এখনও কিউর প্রতিষ্ঠানে স্বর্ণাক্ষর হয়ে আছে।

সিঙ্কোনার এই বীজগুলি কিউতে রাখা হয়নি এবং সেগুলি অতি কম সময়ে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। ধূসর ছাল যুক্ত সিঙ্কোনা গাছের বীজগুলি নীলগিরিতে এসে পৌঁছায় ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং লাল ছাল যুক্ত গাছের বীজগুলি দুইমাস পরে এসে পৌঁছেছিল। ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে Dr. Anderson এর জাভা থেকে নিয়ে আসা ৫০টি *Calisaya*, ৪টি *Lancifolia* এবং ২৮৪ টি *Pahudiana* গাছ ওটাকামুন্ডে Mr. Mcivor এর কাছে পৌঁছে দেন। ১৮৬২ সালের ৪ঠা মার্চ লুক্সা থেকে Mr. Cross এর দ্বারা সংগৃহিত সিঙ্কোনা বীজ ভারতে আসে এবং ভারতে সিঙ্কোনা চাষের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ :

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মাদ্রাজের তুলনায় কম অনুকূল পরিবেশে চাষ শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কোনো গাছ না আসার দরুন হিমালয় বা খাসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে Mr. Markham এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৮৬৯ সালে ভারতের মধ্যে বাংলায় সিঙ্কোনা চাষের

প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল কলকাতার রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Dr. Thomas Anderson-এর নির্দেশনায়। দার্জিলিঙের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ায় সেই সময়ে সিঙ্কোনা রিজার্ভ থাকা সমস্ত বীজ অতিরিক্ত শৈত্য বায়ুর প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে Dr. Thomas Anderson এর পরিচালনায় ১৮৬৯ সালে সিঙ্কোনার পরীক্ষামূলক চাষের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে ১৮৬৬ সালে সিকিমের আবাসিক ব্যবস্থাপক Mr. J.Gammie এর নেতৃত্বে সিঙ্কোনার চাষ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারেননি। Dr. Anderson কতৃক প্রথম সিঙ্কোনা বীজগুলি Sir J.W.Hooker ১৮৬১ সালে কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাঠিয়েছিলেন। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে এই বীজগুলি থেকে Dr. Anderson ৩১টি চারা গাছ তৈরি করতে সক্ষম হন। একই বছরে বাংলার সরকার এবং ভারতের সুপ্রিম সরকার এই বিষয়টিকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে Dr. Anderson কে ডাচের সিঙ্কোনা চাষের পদ্ধতির সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে জাভা পাঠানো হয়েছিল। Dr. Anderson নভেম্বর মাসে জাভা থেকে ৪১২টি সিঙ্কোনা গাছ এবং পর্যাপ্ত পরিমানে *Cinchone Pahudiana* র বীজ নিয়ে আসেন। জাভা থেকে ফায়ার আসার কিছুদিন পরেই Dr. Anderson সিঙ্কোনা গাছগুলি নিয়ে ওটাকামুন্ডে পাড়ি দেন এবং সেখানে Mr. Mclvor-এর নেতৃত্বে ৫০টি *Calisaya*, ২৮৪টি *Pahudiana* এবং ৪টি *Lancifolia*-র চারা গাছ রোপন করেন। সেখান থেকে Dr. Anderson ১৯৩টি Succirubra -র ধূসর ছালের প্রজাতি নিয়ে ওটাকামুন্ড থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। শেষ পর্যন্ত জাভা থেকে আনা কিছু গাছ মারা যাওয়ার কারণে ১৯শে জানুয়ারি ১৯৬২ সালে বোটানিক্যাল গার্ডেনে মোট গাছের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৯টি।

সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছনোর লক্ষ্যে Dr. Anderson সরকারকে সুপারিশ করেছিলেন যে, গাছগুলি যাতে সিকিমের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কিছু অংশে রোপন করা হয়। সরকার এই প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করেন এবং এই বছরের মার্চ মাসে Dr. Anderson একজন মালিকে সঙ্গে নিয়ে ২৪৯টি গাছের চারা দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে রোপন করেন এবং তিনি সিকিমে পরীক্ষামূলক চাষের পদ্ধতির সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেন তার থেকে সিঙ্কোনা চাষের জলবায়ু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পান। এখানে সিঙ্কোনার চাষ করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে *Calisaya* প্রজাতির গাছগুলি এই জলবায়ুতে ঠিকঠাক ভাবে বেড়ে উঠেছে, তার প্রধান কারণ হল এখানে সূর্যালোকের থেকে কুয়াশা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি।

Dr. Anderson সিকিম হিমালয়ের বাইরে পার্বত্য অঞ্চলে সিনচেল চূড়ার কাছে একটি জায়গা বেছে নেন যা প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং এই অঞ্চল সমভূমি থেকে উত্তর দিকে যাওয়া মেঘের একটি বড় অংশকে বাধা দেয়। ১৮৬২ সালে জুনের প্রথম দিকে গাছের সংখ্যা প্রায় কমে যাওয়ার (২১১টি)কারণে সেখানে একটি সংরক্ষণাগার এবং চারা তৈরির নার্সারি স্থাপন করা হয়েছিল। Mr. Jaffrery এর পরিশ্রমে পরবর্তী ৫ মাসের মধ্যে গাছের সংখ্যা অনেকগুন বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে সিনচেলের শীতকালীন জলবায়ু সিঙ্কোনা চাষের জন্যে অনেক বেশি প্রতিকূল প্রমাণিত হয়েছিল। দার্জিলিং জেলার বেশিরভাগ জমি ইতিপূর্বে ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতভাবে চা চাষের জন্য দখল করে নিয়েছিল, তাই Dr. Anderson এর পক্ষে সিঙ্কোনা প্লান্টেশনের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি দার্জিলিঙের নিচে একটি উষ্ণ ও ছায়াযুক্ত জায়গায় যা ঠিক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফুট উঁচুতে লেবং নাম একটি জায়গায়

নার্সারি, বাড়ি এবং একটি বাগান ভাড়া নিয়ে সিঙ্কোনা চাষ শুরু করেন।সিঙ্কেলে সিঙ্কোনার ২৪৮৪টি চারার মধ্যে Pahudiana-র প্রাচুর্য্যই বেশী ছিল, কিন্তু তার মধ্যে অল্প পরিমানে *Succirubra* ও *Calisaya* প্রজাতিও ছিল। এগুলির পরিপূরক হিসেবে মাদ্রাজ থেকে পাঠানো হয়েছিল ৯৭টি *Succirubra*, ২১টি *Calisaya*, ৯৪টি *Officinalis* এবং ১১৫টি ধূসর ছাল যুক্ত প্রজাতির চারা।

স্থায়ী বাগান গঠনের জন্য Dr. Anderson দার্জিলিং থেকে ঠিক ১২ মাইল দূরে রাঙবি নামে এক স্বল্প পরিচিত উপত্যকার ঘন জঙ্গলে সিঙ্কোনার চাষের জন্য জমি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন যা কোন রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। সেই সময়ে সিঙ্কোনা চাষ বিস্তারের জন্য আরো কিছু জায়গার প্রয়োজন ছিল তাই দার্জিলিঙের একটি মধ্যবর্তী অঞ্চল রুঙ্গিরুন জায়গাটিকে তিনি বেছে নেন।

সিঙ্কোনা এবং বিশ্বযুদ্ধ :

নিচের ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে সঠিকভাবে সিঙ্কোনা চাষের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। ইতিপূর্বে কুইনাইন ও বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত সাফল্যের চাবিকাঠি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছিল এবং সেইসময়ে ভারতে সিঙ্কোনার স্থাপন রাজ্য তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্যরা ম্যালেরিয়া অঞ্চলে যুদ্ধ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৯৪২ সালে জাভায় অবস্থিত সিঙ্কোনার প্ল্যান্টেশন এবং বিশ্বের বৃহত্তম কুইনাইন ফ্যাক্টরি 'The Banfoengsche Kininefabrek' জাপানের মধ্যে ছিল এবং মিত্রদেশ গুলির সৈন্যরা বিশ্বের বৃহত্তম কুইনাইন উৎপাদনকারীকে গোটা বিশ্ব থেকে আলাদা করে ফেলেছিল। জার্মান সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই 'Dutch Kina Bureau' দ্বারা পরিচালিত কুইনাইনের প্রধান সরবরাহকারী, ভান্ডার ও কুইনাইন পাতনের জায়গা একচেটিয়া ভাবে অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জাপানি বুলেটের চেয়ে মিত্রদেশগুলির সেনারা বেশি সংখ্যক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৮৫০০ র বেশি মার্কিন সৈন্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যেকটি হাসপাতালে প্রতি ১০জন সৈন্যদের মধ্যে ৬জন সৈন্য ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হতেন। এরকমই ছিল এই রোগের ভয়াবহতা।

বিশ্বযুদ্ধের সময় কৃত্রিম এন্টিম্যালারিয়াল ড্রাগ 'Atabrine' নামের ঔষধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'Atabrine' মূলত জার্মান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট I.G.Farben দ্বারা ১৯৩০ এর ডিস্কের গোড়ার দিকে কয়লার টার থেকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু 'Atabrine'-এ কুইনাইনের কার্যকারিতার অভাব ছিল এবং ভয়ঙ্করভাবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল , যেমন বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া , মাথাব্যথা এবং হলুদ রঙের ত্বকের মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। যদিও এগুলিই শুধু যথেষ্ট ছিল না, জাপানিরা গুজব রাতে যে এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী।

সেই সময়ে এন্টিম্যালেরিয়া কুইনাইনের পযাপ্ত ও স্থায়ী সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পযাপ্ত পরিমানে কুইনাইনের মজুত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাণিজ্য সচিব Jesses Jones ভেবেছিলেন কুইনাইনের দাম খুব বেশী। ফরেন ইকোনমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

তাঁকে প্রয়োজনীয় ওষুধের সঙ্গে কুইনাইন, রাবার, নাইট্রেটস এবং টিন সহ কৌশলগত সামরিক উপকরণগুলি মজুত করার নির্দেশ দিলেও তিনি কুইনাইন মজুত করতে অস্বীকার করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য পরিমানে কম আকাঙ্খিত 'Atabrine' উইনথ্রপ কেমিক্যাল কোম্পানির মাধ্যমে পাওয়া যেত। উইনথ্রপ কেমিক্যাল I.G.Farben-এর অংশীদার ছিল কিন্তু পার্ল হারবারে বোমা হামলার ঠিক আগে এলায়েন্ প্রোপার্টি এক্টের মাধ্যমে জার্মান জায়ান্টের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে আমদানি করা রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে Atabrine'-এর প্রায় ৫ মিলিয়ন ট্যাবলেট তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে উইনথ্রপ কেমিক্যাল তার উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল এবং কোনোরকম রাজস্ব ফি না নিয়ে বেশ কিছু কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরুপ, শীগ্রই Abbott, Lilly, Merch এবং Fredrick, Stearns সহ অন্যান্য ঔষধ কোম্পানির দ্বারা Atabrine' প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত হয়। জার্মানিতে যে রাসায়নিক উপকরণ গুলি পাওয়া যেত না সেগুলি বেশ কিছু রাসায়নিক সংস্থা যেমন হারমোন কালার ওয়ার্কার্স, হিল্টন ডেভিস, আলাইড কেমিক্যাল ডাই কর্পোরেশনের ন্যাশনাল আনিলাইন বিভাগ এবং ফার্মা কেমিক্যাল কোম্পানি দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। পরামর্শমূলক প্রচেষ্টার ফলস্বরুপ, ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ৩.৫ বিলিয়ন Atabrine' ট্যাবলেট উৎপাদিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেনারা এই ওষুধ নিতে অস্বীকার করেন।

কুইনাইনের সংরক্ষনের জন্য আমেরিকা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তাদের ওয়ার প্রোডাকশন বোর্ড ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য কুইনাইন এবং এন্টিম্যালারিয়া ওষুধের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট ছিল যে এই ধরণের পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংকট মোচনের জন্য সৈন্যদের কুইনাইন প্রদানের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করেন। সর্বোত্তম বিকল্প হিসাবে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিয়ান অঞ্চলের স্থানীয় সিঙ্কোনার প্রজাতি সংরক্ষন করে রাখা হয় এবং সর্বোচ্চ কুইনাইন উৎপাদনকারী গাছের চাষ শুরু হয়।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে কুইনাইনের উৎপাদনকে বোর্ড অফ ইকোনমিক ওয়ার ফেয়ার এর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে একটি মার্কিন সরকারি যুদ্ধকালীন এজেন্সির উপর কৌশলগত উপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে কৃষি বিভাগ এবং ন্যাশনাল আর্বোরেটামের সহযোগিতায় 'সিঙ্কোনা মিশন' নাম এক প্রকল্প শুরু হয় যা বোর্ড অফ ইকোনমিক ওয়ারফেয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদ্ভিদবিদ Willium C. Steere এবং কৃষি বিভাগের একজন উদ্ভিদবিদ F.Raymond Fosberg কে সিঙ্কোনা সংগ্রহ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রধান সিঙ্কোনা উৎপাদনকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছিল এবং 'সিঙ্কোনা চুক্তি'র খসড়া তৈরি করেছিল। সমস্ত দেশগুলি সিঙ্কোনা ছালের জন্য " Sole Buying Privileges" চুক্তিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন যাতে নূন্যতম আলকালয়েডের পরিমান ২ থেকে ৩ শতাংশ হয়।

দেশগুলি সিঙ্কোনা অনুসন্ধান ও সংগ্রহে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে সর্বসম্মতি সহকারে সহমত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল যে এর বিনিময়ে আয়োজন দেশে একটি স্থায়ী সিঙ্কোনা প্লানটেশন প্রতিষ্ঠা তৈরি হবে।

১৯৪২ সালে প্রথম সিঙ্কোনা ক্রয়কারী কলোম্বিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যেটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে কুইনাইনের সরবরাহকারী ছিল। পেরু ও ইকুয়াডোরে তখন 'সিঙ্কোনা মিশিও ' চালু হলেও কিন্তু বলিভিয়া যারা কিনা প্রথম উন্নত কুইনাইন সমৃদ্ধ ছালের উৎস ছিল তারা এই চুক্তিটি অনুমোদন করেনি, বরং তারা Dutch Kina Bureau তে এই সিঙ্কোনার ছাল পাঠাতে সম্মত হয়েছিল। তবুও বোর্ড অফ ইকোনমিক ওয়ারফেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অতিরিক্ত কুইনাইন এবং সিঙ্কোনার ছাল কেনার জন্য। যে সব দেশ সিঙ্কোনা গাছের প্রধান উৎস ছিল সেইসব দেশ ছাড়াও কোস্টারিকা এবং গোটেমালার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল। সিঙ্কোনা চাষের কর্মসূচিটি ১৯৩৪ সালের প্রথম দিকেই সার্ক নামক একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর দ্বারা শুরু করা হয় , যা গোটেমালাতে সিঙ্কোনা চাষের অনুসন্ধানকে ত্বরান্বিত করেছিল জাভাতে ডাচদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লেভার প্রয়াসে। এখনকার নার্সারী এবং গবেষণাগার গুলি যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

'সিঙ্কোনা মিশনের' কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুইনাইনের ভালো উৎসের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় আন্দিজে। সিঙ্কোনা গাছের সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একজন উদ্ভিদবিদ , বনবিদ এবং স্থানীয় ল্যাটিন সহকারীদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল 'সিঙ্কোনা মিশনের' প্রথম দিকে প্রায় ৩০ জনের বেশি আমেরিকান উদ্ভিদবিদ এই দলটিতে যুক্ত ছিল দুই বছরের বেশি সময় ধরে। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে এই দলগুলি আন্দিজ পর্বতে সিঙ্কোনার খোঁজে পাড়ি দিয়েছিল এবং সেখানে বিভিন্ন সিঙ্কোনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই দলের উদ্ভিদবিদরা সিঙ্কোনা গাছের সনাক্তকরণ ও সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল। এর সঙ্গে তারা Rubiaceaus গোত্রের প্রজাতিও সংগ্রহ করেছিল পরবর্তীকালে প্রজনন বিজ্ঞানে কাজে লাগানোর জন্য। সেইসময় বনকর্মীদের প্রধান কাজ ছিল ছাল সংগ্রহ করা, ছালের পরিমান নির্ণয় এবং সর্বোত্তম ছাল সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়। ছালগুলো সংগ্রহ করার পর বোগাটা, কলম্বিয়া, কুইটো, ইকুয়েডর, লিমা, পেরু বা লা পাজ এবং বলিভিয়ার ফিল্ড ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হত, যদিও এই কাজটি কঠিন ছিল। ছোট বস্তার মধ্যে ৪০-৮০ পাউন্ড ছাল পরিবহনের জন্য ভারতীয় ব্যাগপ্যাকার যারা ক্যাসকারিলেরস নামে পরিচিত ছিল তাদের ভাড়া করা হয়েছিল।মাঝে মাঝে খড়গুলিকে নিকটবর্তী নদীতে ছালগুলি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হত। কিছু ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছিল যাতে ছাল গুলো আকাশপথে পাঠানো যায়। সিঙ্কোনা চাষের ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি বিশদ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল যেখানে প্লান্টেশন করা যায় এমন জায়গা , ছাল সংগ্রহ করা ও পরিবহনের তাৎক্ষণিক সমস্যা এবং বাণিজ্যিক সমস্যা মোকাবিলার মূল্যবান তথ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিঙ্কোনা বিভিন্ন ধরণের স্ট্রেইনের সাথে সংকরায়িত করা হয় এবং কিছু কিছু জাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের alkaloid উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে শীগ্রই নির্ধারণ করা হয় যে তাদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে পৃথক প্রজাতির alkaloid ধারণ এবং পরিমাণের তারতম্য রয়েছে। কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ভালো এবং খারাপ ছালের শ্রেণীকরণ করা হয়। কিন্তু রঙ বা স্বাদের উপর ভিত্তি করে দ্রুত এবং সহজ পরীক্ষাগুলি অনির্ভরযোগ্য ছিল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছগুলোকে in situ তে উপস্থিত জটিল গোত্রগুলোকে শনাক্ত করার জন্য অনেক উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। আমেরিকার বনকর্মীরা তাদের নিজস্ব দেশীয় গাছগুলোকে সহজেই চিনতে পারত কিন্তু গোড়ার দিকে সিঙ্কোনাকে শনাক্ত করা তাদের কাছে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। স্থানীয় লোকজন সহজে গাছপালা চিনতে পারত না। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য কলম্বিয়া এবং ইকুয়েডরে ছালের কিছু অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও স্থানীয়দের কাছে ছাল ছাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার

অভাব ছিল। উদ্ভিদবিদ, বনবিদ এবং স্থানীয় সংগ্রাহকদের প্রস্তুত করতে এবং স্থায়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কৃষি উদ্ভিদবিদ Fosberg, কৃষিবিদ্যা অনুষদের উদ্ভিদবিদ 'The Cinchona manual' নামে একটি বই স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেন।

এরপরেও অনেক সমস্যা দেখা যায়। শীগ্রই স্থানীয় কালেক্টর জমির মালিক এবং সরকারি সংগ্রহকারী সংস্থার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা শুরু হয়। সহজলভ্য গাছগুলি শীগ্রই কাটা হয়েছিল এবং উদ্ভিদবিদরা আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমি জরিপ করতে শুরু করেছিল। উদ্ভিদবিদরা ১১০০০ ফুটের মতো উঁচু স্থানে সংগ্রহ করার সময় অসুস্থতার সম্মুখীন হয়ে পড়েন এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতায় তাদের পোশাক ও যন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।তারা অপুষ্টি, এমবিক আমানস, এমনকি ম্যালেরিয়া জ্বরেও ভুগেছিলেন।একজন উদ্ভিদবিদ Arthur Feathersonhaugh অতিরিক্ত উচ্চতার কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।উদ্ভিদবিদরা প্রায় দুবছর ধরে নতুন প্রজাতি সন্ধানের প্রক্রিয়া জারি রেখেছিলেন। ১৯৪৪ সালে দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী - কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের William E. Doering এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Robert B. Woodward কৃত্রিম কুইনাইন(একটি নন-স্টাবিওর মিশ্রণ) আবিষ্কার করার কারণে প্রাকৃতিক কুইনাইন এর চাহিদা লোপ পায়। অবশেষে আরও কৃত্রিম কুইনাইনের ঔষধ আবিষ্কার হওয়ার কারনে বাণিজ্যিক ভাবে এর চাহিদা আরও লোপ পায়। প্রধানত এই কারণের জন্য 'সিঙ্কোনা মিশনের' ১২.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের কুইনাইন ছাল ১৯৪৪ সালে জাহাজ মারফত ফেরত আসে। সামগ্রিকভাবে 'সিঙ্কোনা মিশন ' মিশ্রভাবে সাফল্য পেয়েছিল। ১৯৪৫ সালে নভেম্বর মাসে ছাল সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ আমেরিকান সরকারের সাথে সমস্ত চিকটি বাতিল করা হয়েছিল। তারা জোটবদ্ধ যুদ্ধসম প্রচেষ্টার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে সিঙ্কোনা সরবরাহ করেছিল কিন্তু তারা কখনোই উন্নত কুইনাইন সমৃদ্ধ প্রজাতি Cinchona ledgeriana শনাক্ত করতে সক্ষম হননি। সর্বোপরি দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই উন্নত কুইনাইন সমৃদ্ধ প্রজাতির চাষ করেছিল এবং তারা প্রত্যেক বছর এলাকা সম্প্রসারণ করেছিল যা ১৫০ বছর পরে আজও চাষ করা হয় এবং বাজারজাত করে বিক্রি করা হয়।

দার্জিলিঙে বৃক্ষরোপনের ইতিহাস :

দার্জিলিঙে সিঙ্কোনার চাষ ১৮৬১-৬২ সালে শুরু হলেও , প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে দার্জিলিঙে সিঙ্কোনা চাষের পরীক্ষা সফলভাবে প্রসারিত করা বাঞ্চনীয় বলে বিবেচিত করা হয়েছিল যেহেতু পূর্বেই নীলগিরিতে প্রথম এর সফলতা পেয়েছিল।সিঙ্কোনা গাছ বা বীজ পেরু থেকে সর্বপ্রথম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আসে Mr. Clements Markham এর তত্বাবধানে।বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এই বীজের কিছু অংশ Sir J. Hooker এর কাছ থেকে ১৮৬১ সালে Dr. Anderson সংগ্রহ করেন যিনি ক্যালকাটা বোটানিক্যাল গার্ডেন এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন এবং তার তত্বাবধানেই বাংলায় সিঙ্কোনা সমস্ত পরীক্ষামূলক কর্মকান্ড শুরু হয়।১৮৬১ সালে সরকার বিষয়টিকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং তাকে জাভাতে সিঙ্কোনা চাষ পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়। তিনি সেখানকার কতৃপক্ষের কাছ থেকে সবধরণের সহায়তা পেয়েছিলেন এবং প্রচুর পরিমানে উন্নত মানের সিঙ্কোনা গাছ নিয়ে এসেছিলেন। দার্জিলিং থেকে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্বে রনজু উপত্যকার রাঙবি তে সিনচেল থেকে একটু উচ্চতায় দীর্ঘকায় ঢালে একটি স্থায়ী বৃক্ষরোপণের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩০০ থেকে ৪০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ছিল।

১৮৬৪ সালে সিঙ্কোনার যে সমস্ত প্রজাতি কুইনাইন এবং অন্যান্য সহ alkaloid সমৃদ্ধ ছিল সেই সমস্ত প্রজাতির সিঙ্কোনার গাছ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। Cinchona succirubra এবং এর প্রত্যেকটির ১০০টি গাছ ও Cinchona officinalis দুটি গাছ নিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উচ্চতায় রোপনের কাজ শুরু হয়। সম্প্রসারণের প্রায় ১০ বছরের মধ্যে গাছের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ। তাদের মধ্যে *C.succirubra*-র সংখ্যাই বেশি ছিল যার মধ্যে বেশিরভাগই রাঙবি পূর্বে এবং দক্ষিণে রনজু ভ্যালির এবং মংপু পার্বত্য

অঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। উত্তরের লাবদা এবং রিয়াং উপত্যকার দক্ষিণ ঢালের সিটং এ ১৮৮১ সালে প্রায় ৭৫০ একর জায়গায় সিঙ্কোনা চাষের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

প্রায় প্রথম দশকে প্ল্যান্টেশনের বেশিরভাগ গাছই ছিল *C.succirubra* . এই প্রজাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লালছাল, কুইনাইনের কম আধিক্য কিন্তু অন্যান্য সহ alkaloid এর মিশ্রনে সমৃদ্ধ।এই প্রজাতির কুইনাইনের কম আধিক্যের কারণে *C.calisaya* এবং *C.ledgeriana* প্রজাতি চাষ বাড়ানো হয়েছিল কারণ তারা সবচেয়ে বেশি কুইনাইন সমৃদ্ধ হলুদ ছাল উৎপাদনকারী প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চাষের সম্প্রসারণ:

১৮৮০ সালে রঞ্জু ও রিয়াং উপত্যকায় মূল প্ল্যান্টেশনের কাছাকছি এলাকায় জমির সংখ্যা কম হওয়ায় ক্রমবর্ধমান কুইনাইনের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে আরও জায়গার প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে, ১৮৮৩ সালে কালিম্পঙ এবং রঞ্জু উপত্যকায় ৩০০ একর জমিতে প্রথম প্ল্যান্টেশনের কাজ শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে প্রায় ৭০০০ একর পর্যন্ত সিঙ্কোনার বিস্তার হয়েছিল যা কালিম্পঙ থেকে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্বে প্রসারিত ছিল। বর্তমানে প্রায় ৫০০ একর মনসং বিভাগের জমিতে ledgeriana প্রজাতির সিঙ্কোনা রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ১২,০০,০০০।

১৯০৬ সালে সরকারী সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন নিম্নলিখিত জায়গাগুলো সংগঠিত হয়েছিল ::

১) রাঙবি এবং মংপু বিভাগ নিয়ে গঠিত রঞ্জু ভ্যালি যা একসাথে প্রায় ৯০০ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। যেখানে প্রায় দুই মিলিয়নের বেশি সিঙ্কোনার গাছ রয়েছে,যার মধ্যে ১.৫ মিলিয়নেরও বেশী *Cinchona calisaya*, *C.ledgeriana* ০.৫ মিলিয়ন শংকর প্রজাতি এবং বাকি *Cinchona succirubra* প্রজাতির সিঙ্কোনা।

২) রিয়াং উপত্যকা ব্লকের সিটং এবং লাবদা বিভাগ প্রায় ৬০০ একর নিয়ে গঠিত সেখানে প্রায় দুই লক্ষের বেশি সিঙ্কোনা গাছ রয়েছে যার অর্ধেকের বেশি *C.succirubra* ও শংকর প্রজাতি এবং বাকিটা *C.calisaya* ও *C.ledgeriana* প্রজাতি।

৩) রংপো উপত্যকার মধ্যে মনসং বিভাগ।

চাষ পদ্ধতি :

প্লান্টেশনের কাজ শুরু করার ১ বছর পূর্বে গভীর জঙ্গল কেটে ফেলা এবং সেগুলি পুড়িয়ে ফেলার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। বর্ষাকাল সম্পন্ন হওয়ার পরেই ছোট ছোট আগাছা গুলি কেটে এবং অন্যান্য গাছের মূল গুলিকে তুলে নিয়ে দু-ফুট মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয় যাতে জায়গাটি আগাছা মুক্ত থাকে এবং সেখানে অবস্থিত পাথর-নুড়ি সঞ্চয় করে উঁচু অঞ্চলে রাখা হয় যাতে বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে নিয়ে চলে না যায়। সিঙ্কোনা বীজ দেখতে খুবই ছোট এবং তুষের মতো দেখতে হয়। সিঙ্কোনা চারা গাছগুলি লাগানোর পূর্বে তাদের প্রজাতি অনুসারে ৫ থেকে ৬ ফুটের ব্যবধানে গর্ত তৈরি করা হয় এবং মাটিগুলিকে আলগা করে রাখা হয়। বসন্তের ঠিক শুরুতেই রোপনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। সিঙ্কোনা বীজগুলি ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের মধ্যে সঞ্চয় করা হয় এবং নার্সারিতে বেডের মধ্যে বপন করা হয়। কিন্তু যত্ন সহকারে এই বেডগুলি তির্যকভাবে ছাউনি দিয়ে ঢাকা থাকে যার সামনের দিকটি ৫ ফুট উচ্চতা এবং পিছন দিকটি ২ ফুট উচ্চতা রাখা হয়। নার্সারি বেডগুলি উত্তরমুখী ভাবে তৈরি করা হয় যাতে সূর্যালোকের তাপে বেডগুলি আবার শুকিয়ে না যায়। নার্সারি বেডের চারাগুলি উচ্চতা যখন ১/২ ইঞ্চি হয়, তখন সেগুলিকে আবার দ্বিতীয় বেডে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পরে ওই চারাগুলি ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি উচ্চতা

সম্পন্ন হলে তাদের আবার একটি অন্য বেডে স্থানান্তরিত করা হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যে এই চারাগুলির বয়স যখন এক বছর হয়ে যায় এবং এক ফুট উচ্চতা সম্পন্ন হয়, তখন নার্সারি বেডগুলির ছাউনি সরিয়ে ফেলা হয়, যাতে চারাগুলি সূর্যালোকের আলোর প্রভাবে শক্ত হতে পারে। ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল মাসে এই চারাগুলি কে তাদের প্রধান জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বেড়ে ওঠার উপযুক্ত আবহাওয়া প্রস্তুত হলেই প্রথম এক বছর অত্যন্ত যত্ন নিতে হয়। সময় মতো কাস্তের সাহায্যে চারাগাছের আশপাশ আগাছামুক্ত রাখা হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্লান্টেশনের আগাছাগুলোকে হাতে করে তুলে সিঙ্কোনা গাছের গোড়ায় ফেলে রেখে দেওয়া হয় যা পরবর্তী সময়ে পাতা পচা সারে পরিণত হয়।

সিঙ্কোনা গাছের বয়স যখন ৩ বছর হয় তখন থেকেই তার ছালের পরিচর্যার কাজ শুরু হয়ে যায়। যেখানে গাছগুলি অতিরিক্ত ঝাড়পাত সম্পন্ন হয়ে পরে সেখানে গাছগুলির ডালপালা হালকা করে ছেঁটে ফেলা হয় এবং অস্বাস্থ্যকর গাছগুলিকে মাটি থেকে তুলে ফেলা হয়। প্রত্যেক বছরই এই কাজটি চলতে থাকে। গাছ থেকে ছাল গুলিকে নেওয়ার জন্য প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় - মূল, কান্ড ও শাখা-প্রশাখা। ছালগুলিকে একটি ভোঁতা ছুরির সাহায্যে ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের শ্রেণীকরণ করে খোলা বাতাসের মধ্যে শুকানোর জন্য রাখা হয় এবং পরবর্তীকালে শুকিয়ে যাওয়ার পর বর্ষাকালে গুদামের মধ্যে সঞ্চয় করা হয়। গুদামের মধ্যে মূল, কান্ড ও শাখা প্রশাখা থেকে ছাড়ানো ছালগুলিকে পৃথকভাবে রাখা হয় এবং পরবর্তীকালে সেগুলি alkaloid নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকারি কুইনাইন ফ্যাক্টরিতে পাঠানো হয়।

গ্রামীণ পর্যটনের অনবদ্য সম্ভার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

আবহমান কাল থেকে বঙ্গজীবন ও পর্যটন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রকৃতির বদান্যতায় আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যে অনিন্দ্য সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । উত্তরের গগণচুম্বী তুষারমৌলি হিমালয় অঞ্চলসমূহ, অনুপম ডুয়ার্স - সেখানে অরণ্যানী ও অভয়ারণ্য; দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের সৈকত ভূমি ও সঙ্গে উপকূল বাংলার মনোরম ঝাউবন, নদীজল-বেষ্টিত সুন্দরবন পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য সম্ভার ও বহুমুখী হস্তশিল্প; মধ্য বাংলা বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও মালদা এবং দুই দিনাজপুরের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের মণিমুক্তা ছাড়াও অজস্র তীর্থক্ষেত্র এবং অভিনবত্বের সব নিরিখে পর্যটনের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা অনেক এগিয়ে।

এইসব বিখ্যাত ও চিহ্নিত স্থানগুলি ছাড়াও আমাদের গ্রাম বাংলা যে কি অসাধারণ লোকশিল্পের মণিমাণিক্য খচিত উৎস ভূমি এবং কত যে অভিনব ভাস্কর্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রাজ্যে পর্যটনের জনপ্রিয়তা শুধু যে বাড়িয়ে দিতে পারে তা নয় আর্থিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষেও অনুকূল হতে পারে। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার ও সাংস্কৃতিক অনন্যতাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে পারলে আমাদের যে ষোলো আনাই লাভ আশা করি এর জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যে কোনো পর্যটকের প্রত্যাশার প্রায় সমস্ত সব কিছুই আছে আমাদের রাজ্যে। প্রত্যাশা ও চাহিদা পূরণে আশানুরূপ গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণ হয়তো বা এখনো পুরোমাত্রায় ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারেনি আন্তর্জাতিক স্তরে স্থানীয় পর্যটকরা এখনো সুবিশাল ভাবে গ্রাম বাংলার দিকে কেন যে মুখ ফেরাচ্ছেন না তা নিয়ে ভাবনা হয়।

আশাকরি খুব শীগ্রই অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং বাংলার বহুমুখী ও সাবেক হস্তশিল্প যেমন খ্যাতিধন্য ডোকরা শিল্প, পোড়ামাটির শিল্প, গ্রামের শঙ্খ শিল্প, চড়িদার বিখ্যাত ছৌ নাচের সেরা মুখোশ, কুশমুন্ডির কাঠের ও বাঁশের কারুকার্য এইসব হেরিটেজ ছাড়াও অনবদ্য গ্রামীণ শিল্পের সম্মুখীন হওয়া শিল্পীদের কাজ নিজের চোখে দেখার আনন্দ ই আলাদা। বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের কাছে নতুন গ্রামে বিভিন্ন ধরণের কাঠের পুতুল তৈরির যে উদ্যোগ ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে চলা এই শিল্প সুষমা দিনভর ঘুরে দেখলেও একঘেয়েমি আসবে না।

গেলে তাক লেগে যাওয়া কাকে বলে সে তো বোঝাই যাবে না। বালিচক স্টেশন থেকে খুব সামান্য পথ এই পিংলা। এতো গেলো কিছু কয়েকটা সাবেক শিল্পের কথা যা দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্বল।

পাঁশকুড়ার কাছে কংসাবতীর কূলে ক্ষিরাই সারা বছর ধরে কত যে অজস্র ফুলের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই ফুল উপত্যকায় যিনি একবার ও যাননি, তিনি হয়তো বুঝতেই পারবেন না যে কি অসাধারণ কাজ ফুলচাষিরা করে চলেছেন সেখানে। আবার সেই ফুল আসছে ভারতের সবচেয়ে বড় ফুলের বাজার হাওড়া ব্রিজের ঠিক নিচেই জগন্নাথ ঘাটের কাছে। সেও এক অপরূপ দৃশ্য।

শুধু ফুল নয়, হাওড়ার দাসনগরে রঙিন মাছের বাজার, হাতিবাগানের কাছে(গ্যালিফ স্ট্রিট) রঙিন মাছ ও পাখির বাজার এবং নৈহাটির কাছে রাজেন্দ্রপুর বটতলায় ৩৬৫ দিনের রাত্রের মাছের বাজার এক অভিনব যা না দেখলে যেকোনো পর্যটকের আফসোস থেকে যেতেই পারে।

আশা রাখবো এই সমস্ত সাবেক গ্রামবাংলার গ্রামীণ শিল্প- সফর যেকোনো পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে আর তাদের এই সফর সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের জীবিকা বাঁচিয়ে রাখবে। গ্রামবাংলার অনবদ্য শিল্প কর্মকান্ড এবং নিষ্ঠাবান কর্মীরা নিজেদের কর্মোদ্যোগে অভিনব সব সৃজনশীলতার পরিচয় দেবেন।

Intelligent Farming

Mrinmoy Datta

India, which accounts for about 18% of global population , is expected to surpass China by 2023 to become the World's most populated country. With this, comes the pressure to feed many mouths. Statistical estimations indicate that by 2030, demand for pulses ,cereals, eggs, fruits, vegetables and milk will be more than twice of what it was in 2000, while the demand for foodgrains is expected to jump by more than 85%.

Considering the future of food production to be made digital, new technologies for agriculture must be in the mode of AI (Artificial Intelligence) which has the potential , as per Niti Aayog, to add $1 trillion in India's economy by 2035. AI can soon prove to be a boon to Agriculture sector not only in India but worldwide and can help ensure food security for all. AI powerd solutions can enable farmers to do more with less and improve quality and develop superior and consumer friendly marketing infrastructure.

The Smart or intelligent farm includes the use of technology such as:

- Sensors for soil , water, light, humidity and temperature management
- Telecommunications technologies such as advanced networking and Global Positioning System (GPS)
- Hardware and software for specialized applications and for enabling Internet of things (IoT) -based solutions, robotics and automation
- Data analytics tools for decision making and prediction. Data collection is a significant part of smart farming as the quantity of data available from crop yields
- soil-mapping, climate change, fertilizer applications, weather data, machinery and animal health continues to escalate
- Satellites and drones for gathering data around the clock for an entire field. This information is forwarded to IT systems for tracking and analysis to give an "eye in the field" or "eye in the barn" that makes remote monitoring possible

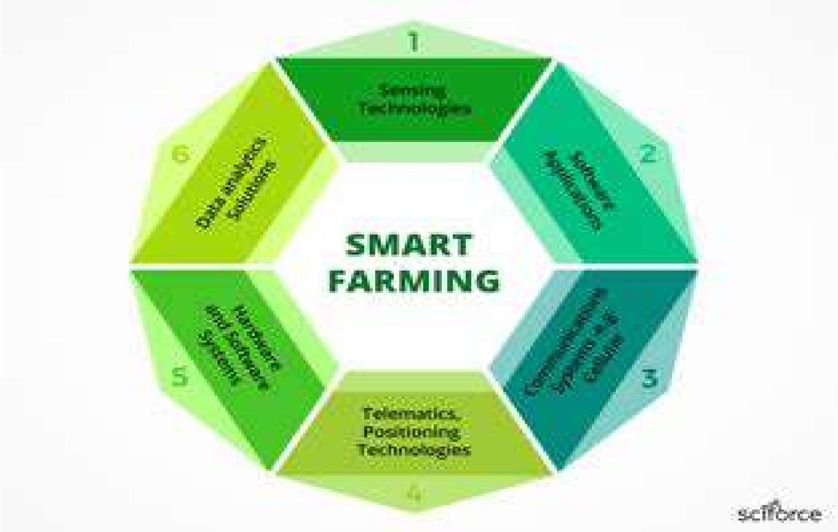

A view of Smart or Intelligent Farming

Armed with such tools, farmers can monitor field conditions and make strategic decisions for the whole farm or a single plant without even needing to step foot in the field. The driving force of smart farming is IoT— connecting machines and sensors integrated on farms to make farming processes data-driven and automated. Many believe that IoT can add value to all areas of farming, from growing crops to forestry.

Precision farming, or precision agriculture, is an umbrella concept for IoT-based approaches that make farming more controlled and accurate. In simple words, plants and cattle get precisely the treatment they need, determined by machines with superhuman accuracy. The biggest difference from the classical approach is that precision farming allows decisions to be made per square meter or even per plant/animal rather than for a field. By precisely measuring variations within a field, farmers can boost the effectiveness of pesticides and fertilizers, or use them selectively.

Drones equipped with sensors and cameras are used for imaging, mapping, and surveying the farms. They can be remotely controlled or they can fly automatically through agriculture software-controlled flight plans in their embedded systems, working in coordination with sensors and GPS. From the drone data, insights can be drawn regarding crop health, irrigation, spraying, planting, soil and field, plant counting and yield prediction, and much more..

As is the case of precision agriculture, smart farming techniques enable farmers better to monitor the needs of individual animals and to adjust their nutrition accordingly, thereby preventing disease and enhancing herd health.Large farm owners can use wireless IoT applications to monitor the location, well-being, and health of their cattle. With this information, they can identify sick animals, so that they can be separated from the herd to prevent the spread of disease.

Computer imaging involves the use of sensor cameras installed at different points on the farm or drones equipped with cameras. The images they capture undergo digital processing to derive meaningful insights from them. They are used for quality control, disease detection, irrigation monitoring, and sorting and grading the produce after harvest. Image processing using machine learning incorporates comparing images from a database with images of standing crops to determine the size, shape, color, and growth, therefore controlling the quality.

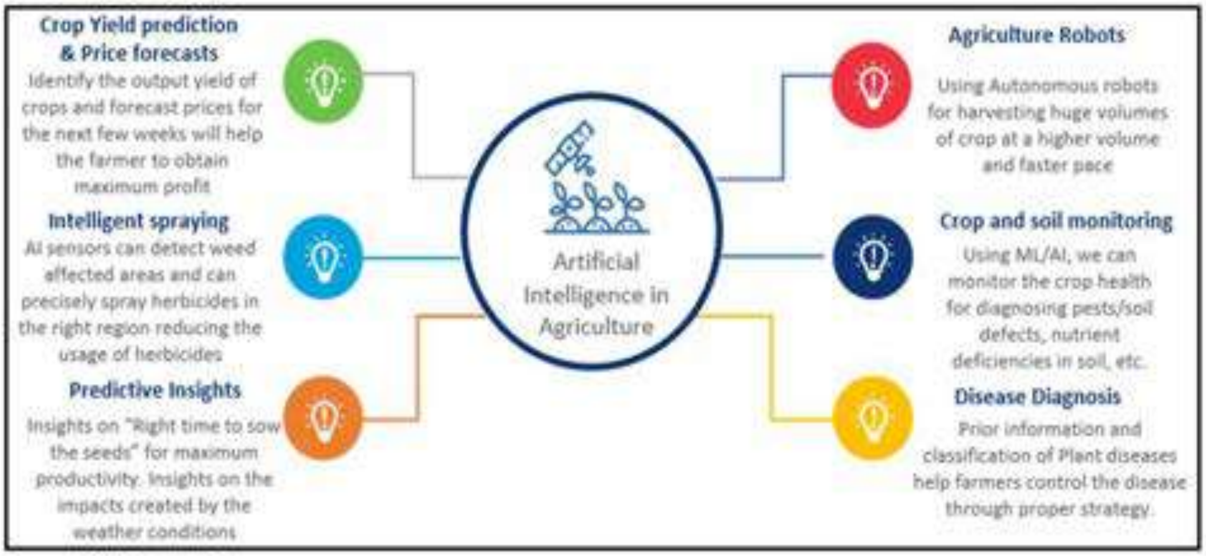

Future Farming Approach

There are many challenges of AI rollout, although AI and machine learning can help monitor crop health , diagnose pest /soil defects and nutrient deficiencies on a real time and predictive basis aiding farmers obtain higher yield and proper market to obtain maximum profits. Main challenges are lack of supporting ICT , Data Infrastructure, Deficient telecommunication networks and , poor internet connectivity, insuffient profieciency in data analysis and lack of financial assistance for small farms to adopt and deploy ICT devices and embedded systems. About 86 % farmers are small and marginal who cultivate 47 % of India's arable land.

Besides ICAR's effort to enhance competitiveness of farming in India and make it viable, self sustaining and internationally competitive enterprise using AI-enabled farmers' advisories for critical agricultural operations and climatic events ,various private players such as Infosys Smart Solutions , Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) , Tata Trust, IITs are also collaborating to solve various agrarian problems.

VIPASSANA MEDITATION AND ITS USEFULNESS

Satyabrata Maiti

Human being is regarded as the superior creature of God. The virtues which play the crucial role for its superiority are conscience of judging right or wrong, thinking power, intelligency and self-control for a balanced, disciplined and dignified life. But these virtues are often disturbed by *Sadaripues* or inner enemies of mind. They are *Kama(desire), Krodha(anger), Lobh(greed), Moho(attachment), Mod(arrogance/vanity) and Matsarya(jealousy)*. These *Shadaripues* are root causes of all sufferings of mankind in this material world. From days immemorial, the wise men have tried to find out ways and means to overcome these sufferings by self-control of mind and to lead a different kind of life which is called the spiritual life. The spiritual life is the purification of mind in several stages through eliminating the vices of *Sadaripues* and not to be influenced by these evil instints.

Meditation is one of the means for self purification for attaining a higher positive energy state of mind by practising certain rituals.It's very difficult to define meditation. It's a way to achieve salvation or to achieve *moksha or nirvana.*

Origin of Meditation

The time line meditation history if we look into, we will find that the oldest documented evidence of the practice of meditation is wall art in India during 5000-3500 BC. Written evidence of meditation we can find in Veda in 1500 BC. During 600 -500 BC other forms of meditation developed in Taoist China and Buddhist India. Christian Meditation started with Hesychasm, a tradition of contemplative prayer in the Eastern Orthodox Church, and involves the repetition of the Jesus prayer during 10th to 14th century. Islamic Meditation, Dhikr is interpreted by various meditative techniques and becomes one of the essential elements of Sufism which started during 11th and 12th centuries.

Meditation became more prominent in western world, especially in the United States, when Swami Vivekananda delivered his lecture at the Parliament of Religions in Chicago.His presentation created a new surge of interest in Eastern models of spirituality in the West, and influenced a number of other spiritual teachers from India to migrate to the States including: Swami Rama from the Himalayan Institute; Paramahansa Yogananda from the Self-Realization Fellowship; Maharishi Mahesh Yogi with his Transcendental Meditation practice, etc.

What is Vipassana Meditation

Vipassana may be a new vocabulary to some and has no idea about what it means. Vipassana means "special viewing" and in the ancient Pāli language it means "insight". It is the essence of the Buddha's teaching about how to make actual experience of the ultimate truth. Even truth (Satya) is of various kinds: "Sabhda-satya"(=sounds that seems true), "Anuman-satya (=imagination that seems true)", "Prakat-satya (=that appears as true)", Saṃvṛti-satya (=empirical that common people understands which may be far away from the ultimate truth) and Paramartha-satya (=means ultimate truth). Vipassana guides us to see the ultimate truth that will liberate us from "Dukha".

The Buddha himself experienced the ultimate truth by the practice of meditation, and therefore meditation is what he primarily taught. Not the religion that people believe. He of course talked about "Dhamma" which is not religion but the characteristic or quality of human being as all Indian literature writes "Dharama of water" or Dharama of physical matter". He did not establish any organized religion (Buddhaism). His words are records of his personal experience in meditation, as well as like detailed SOP of modern science in the form of instructions on how to practice in order to reach the goal he had attained in experiencing the ultimate truth.

The Buddha in his whole life targeted to remove "Dukha" from the life of human being since it is a kind of mental disease which is again universal and distributed irrespective of cast, creed, colour, country, rich or poor.

what is "Dukha"

Every human being has experience of "suffering", "unhappiness", "pain", "unsatisfactoriness" or "stress" in life. It is a part and parcel of our life as well as modern life style has added more such elements in our life. Stress related diseases are in increasing trend. What modern medical science called Psychosomatic (Psycho=mind; soma=body) diseases that was investigated and thoroughly understood by Gautama the Buddha about 2500 years ago. He worked through his whole life to liberate people from it by distributing his wisdom gained by walking in the path of liberation. He identified presence of it in all stages of life: "Jati vi Dukha"; "Vyadhi vi Dukha"; "Jara vi Dukha" and "Maranam vi Dukha". We all want happiness but happiness also turns to "Dukha" because of our "Avijja or Avidhya (=lack of understanding and awareness)". Rabindranath Tagor elaborately expressed this conversion from happiness to sorrow in his poem:

"সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময় ।

সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?

লোকে তবে করে কী সুখেরই তরে এমন দুখের আশ ।"

It is now well established that more than 90 per cent of our physical illness is psychosomatic such as spondylitis, hyper-acidity, high blood pressure, insomnia, diabetics, etc. or these are the root cause of other diseases such as heart problem, arthritis, etc. These all are cause of our misery.

The Buddha walked like a doctor scientist the entire path that causes "Dukha" and investigated the aetiology of "Dukha" disease, its ins and out, length and breadth from surface to core through his own bodily experience and then discovered the method of its control ie. "Dukha Nivaran". He discovered first, two Noble Truths: "Dukkha-sacca" (=Suffering), and "Samudaya-sacca"(= Its origination and multiplication) which is "Law of Dependent Origination" as given below:

Avijja (ignorance) ARISES > **Sankhara** (volitional activities) ARISES

Sankhara (volitional activities) ARISES > **Vinnana**
(consciousness)

Vinnana (consciousness) ARISES > **Nama- rupa** (mind and matter)

Nama- rupa (mind and matter) ARISES > **Salayatana** (six sense doors)

Salayatana (six sense doors) ARISES > **Phassa** (contact)

Phassa (contact) ARISES > **Vedana** (sensation)

Vedana (sensation) ARISES > **Tanha** (craving)

Tanha (craving) ARISES > **Upadana** (clinging)

Upadana (clinging) ARISES > **Bhava** (becoming)

Bhava (becoming) ARISES > **Jati** (birth)

Jati (birth) ARISES > **Jara-marana** (decay and death)

Thus this vicious circle of "Dukha" rolls on. In other words, the origin of each link depends upon the preceding one. As long as this chain of twelve causal relations operates, the wheel of becoming (bhava-cakka) keeps rolling, bringing nothing but "Dukha".

This process of **cause and effect** is called "Anuloma-paticcasamuppada" (**Direct Law of Dependent Origination**).

Every link of "Anuloma" results in "Dukkha", suffering, as a result of avijja (=ignorance), which is at the base of every link. Thus the process of "anuloma" clarifies the first two Noble Truths: "Dukkha-sacca" (=Suffering) and "Samudaya-sacca" (= its origination and multiplication).

How to Get rid of “Dukha” or Control “Dukha” in our life

The Buddha discovered the first two novel truths and then when saw that it is a chain link of depended origination, naturally he found that it can be stopped if we can break the chain. But like a scientist he found that all links cannot be destroyed. For example, mind and matter cannot be destroyed; similarly, six sense doors cannot be destroyed; birth cannot be destroyed. He discovered next two laws:

“Patiloma-paticcasamuppada” (=the Law of Dependent Origination in reverse order) which clarifies the **third and fourth Noble Truths**, “Nirodha-sacca” (= the cessation of suffering) and “Nirodha-gamini-patipada-sacca” (= the path that leads to the cessation of suffering).

“Vedana” is the cause of “Tanha”, which gives rise to “Dukkha” and therefore, he discovered a method to convert ignorance into wisdom and with that **“Vedana-nirodha, tanha-nirodho”**which means complete cessation of suffering. This process of cessation is called Vipassana meditation which he was teaching in rest of his life to the people with great compassion and love.

what is “Vedana”

In Sanskrit, “Vedana” means anguish. But in Pali it means either "feeling" or "sensation." In general, “vedanā” refers to the pleasant, unpleasant and neutral sensations that occur when our internal sense organs come into contact with external sense objects and associate with the consciousness. Our primary senses are considered to be **sight, hearing, taste, smell, and touch**. All senses require one of four fundamental sensory capacities: chemoreception, photoreception, mechanoreception, or thermoreception.

In Vipassana, we start observing “Vedana” only on the surface level of the body and gradually one can fell inside. Whatever you feel on the surface is called sensation. It can be felt as itching, pain, heat, cold, numbness, trickling, pressure, heaviness, throbbing, etc., even some sensation, you cannot even name. Therefore, never search for anything different as sensation. When we practise awareness to sensation and equanimity together, that leads to liberation from suffering.

Understanding of our own nature and understanding achieve by direct experience of truth deep within ourselves, that is what the Buddha called **“yathā-bhūta-ñāna- dassana”,** the wisdom that arises on observing reality as it is not as we like it be. With this wisdom we can emerge from suffering and every sensation that occurs will give rise only to the understanding of impermanence.

Process of Vipassana Meditation:

It has three segments such as **"Seella"** (=Foundation); **Samadhi** (=Concentration) and **Panna** (=Wisdom). To understand fully of this technique, one has to undergo a 10-day Vipassan course in any of the Vepassna centers in India or abroad (https://www.dhamma.org)

I invite all my readers to experience this unique tool for better understanding of life. I do believe, that our children above 16 years old must be exposed to such teachings so that they can be a "আদর্শ ছেলে" as visualized by poet কুসুমকুমারী দাশ

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?
মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন
"মানুষ হইতে হবে" — এই তার পণ,
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ ?
হাত, পা সবারই আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়,

আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায় |
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ —
"মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন" |
কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ |

বিভিন্ন খাবার সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা

কৃষ্ণেন্দু দাস

আমদের দেশের মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর সাথে অশিক্ষাজনিত কতগুলো অদ্ভুত ভুল ধারণা খাবার সম্বন্ধে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ফলে যা খাবার খাই তার পৌষ্টিক মান অনেক কমে যায়।একটু যদি এই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায় তাহলে আমরা অপুষ্টি থেকে অনেকটা মুক্তি পাব। এই প্রসঙ্গে কিছু ভুল ধ্যানধারণার সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক।

- **মাতৃদুগ্ধ**

শিশু জন্মের পর প্রথম দু-তিন দিন মায়ের স্তন থেকে খুব অল্প পরিমাণে ঈষৎ হলুদ বর্ণের ঘন তরল পদার্থ বার হয় একে "কোলাষ্টাম' বলে। দুধের মত সাদা রং না হওয়ার জন্য অনেকের ধারণা এটা দুধ নয় এবং এটা খেলে শিশুর হজমের গোলমাল হবে। এটা ভুল ধারণা। এটা শিশুর পক্ষে খুবই উপকারী কারণ এটা শিশুকে নানা প্রকারের রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এটা সমস্ত নবজাত শিশুর খাওয়া উচিত।

- **ডিম**

অনেকের ধারণা ডিম খেলে পেট গরম হবে। এই ধারণা একদম ভুল বরং ডিমে যে প্রোটিন আছে, তা সহজেই হজম হয় ও শরীর প্রায় সব প্রোটিনই গ্রহণ করে। তবে ডিম সবসময়ই একটু গরম করে খাওয়ানো উচিত। এতে ডিমের ভিটামিনটা পুরোপুরি শরীরে যায়। অনেক মা তার শিশুকে শুধু ডিমের কুসুম দিনের পর দিন খাইয়ে যান। এটা মোটেই ভাল নয়। কুসুমে চর্বি জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে এবং হজম করতে অসুবিধা হয় ।সেই জন্য পুরো ডিমটাই শিশুকে খাওয়ানো দরকার।তাই ডিম সবচেয়ে ভালো এবং সস্তা খাবার।

- **মাছ**

অনেকের একটা অদ্ভুত মানসিকতা দেখা যায় সেটা হলা সিঙ্গি, মাগুর মাছ না খাওয়ালে বাচ্চার যেন স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না। এই ধারণা যে কোথা থেকে এসেছে বোঝা মুশকিল। কম চর্বিযুক্ত যে কোন জ্যান্ত মাছই খাওয়ানো যেতে পারে। কারণ সব মাছের প্রোটিন প্রায় একইরকম - সামান্য উনিশ-বিশ।মাছের চর্বিতে (সামুদ্রিক মাছে বেশি থাকে) এমন কতকগুলো পদার্থ থাকে যা রক্তে ক্লোরেস্টেরল কমায়।

- **ফল**

অনেকের ধারণা ফল খেতে হলে আপেল, আঙুর না হলে চলবে না।অধিকাংশ ফলের পুষ্টিমূল্য প্রায় এক এবং সব ফলেই মোটামুটি ভাল পরিমাণ ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এর মধ্যে আবার পাকা আম ও পাকা পেঁপেতে ভালো ভিটামিন থাকে। কুমড়োতে ভাল পরিমাণ ভিটামিন থাকে এবং কাঁঠাল

খুবই উপকারী ফল। আবার কলা খেলে শিশুদের তড়কা বা ফিট হয় এই ভুল ধারণাও অনেকের আছে। প্রকৃতপক্ষে কলার মতন উপকারী ফল খুব কমই আছে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো বড়লোকদের ফল 'আপেল', 'আঙুরে খুব কম পরিমাণ ভিটামিন সি আছে আর এদিকে ভিটামিন-কে বৈজ্ঞানিকরা মহৌষধ বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের মতো গ্রীষ্মকালীন দেশে আমাদের দেশীয় ফলগুলি খুবই উপকারী আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, জামরুল, পানিফল ইত্যাদি।

- **মাছ মাংস**

অনেকের ধারণা মাছ, মাংস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এটা একেবারেই ঠিক না। আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরামিষভোজী। তাহলে তারা কি করে বেঁচে আছেন? এর উত্তর হলো আমাদের শরীরে নয়টা অ্যামিনো অ্যাসিড একান্ত প্রয়োজন। এদের বলে এসেনসিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। এখন মাছ,মাংসে অ্যামিনো অ্যাসিড এমন পরিমাণে আছে যা শরীরের জন্য খুবই উপকার করে। চাল এবং ডাল (৪ : ১) অনুপাতে মিশিয়ে অর্থাৎ খিচুড়ি খেলে মাছ, মাংসের সমান পুষ্টি হয় কারণ শরীর নয়টা অ্যামিনো অ্যাসিড পায়।অতএব মাছ, মাংস না খেলেও চলে। তাছাড়া গুগলিতে ১২% প্রোটিন আছে। অতএব গুগলি খাওয়া অভ্যাস করলে প্রোটিনের অভাব মেটানো যায় এবং দামী মাছ, মাংসের দরকার হয় না।

- **তেল বা ঘি**

ঘি-এর চাইতে তেল সস্তা এবং পৌষ্টিক মূল্য ঘি অপেক্ষা কম নয়, বরং বেশি। এই সৌখিন খাদ্যটি অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়।

- **চিনি না গুড়**

গুড় চিনির চেয়ে সস্তা এবং পুষ্টিমূল্যও বেশি। কারণ চিনি থেকে শুধু শক্তি আসে, আর গুড় থেকে শক্তি এবং আয়রণও আসে। অতএব গুড় খাওয়াই ভালো।

- **দুধ না স্কিমড মিল্ক পাউডার**

স্কিমড মিল্ক পাউডার দুধের চেয়ে সস্তা। একমাত্র স্নেহপদার্থ ছাড়া পুষ্টিমূল্যে স্কিমড মিল্ক পাউডার ও দুধের খুব একটা তফাৎ নেই। সেইজন্য শিশুদের খাবার ছাড়া অন্যান্যদের বেলায় এই পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পাউডার দিয়ে দইও খুব ভাল হয়।

- **ভাতের মাড়**

অনেকের ধারণা ভাতের ফ্যান ফেলে দেওয়া ভাল কারণ মাড় সহ ভাত হজম করা কঠিন। কিন্তু এটা খুবই ভুল।কারণ মাড় ফেলে দিলে অনেক উপকারী ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ চলে যায়। অতএবে ভাত সিদ্ধ করতে যতটা জল লাগে ততটা দেওয়া উচিত যাতে ভাল সিদ্ধ হবে কিন্তু মাড় থাকবে না। সাধারণতঃ চালের পরিমাণের দুই বা আড়াই গুণ জল দিলেই চলবে।

- **শিশুদের ডাল খাওয়া কি উচিত ?**

একটি ভুল ধারণা অনেক জায়গায় প্রচলিত যে শিশুদের ডাল খাওয়া উচিত নয়। কারণ পেটে গ্যাস হয়। সেইজন্য মায়ের দুধ ছাড়াবার পর শিশুদের শুধু ভাত ও গম সিদ্ধ খেতে দেওয়া হয়। যার ফলে শিশুরা ভাল প্রোটিনর উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুরা সুসিদ্ধ ডাল ভাল পরিমাণে খেতে পারে বিশেষতঃ মুসুর ডাল খাওয়া খুবই ভাল। কল বেরোবার পর আস্ত বা রোদে কিছুটা শুকিয়ে, ভেজে বা গুঁড়ো করে ডাল শিশুদের খাওয়ানো ভালো।

অতএব একটু যদি সঠিকভাবে খাওয়া যায় তাহলে আমাদের দেশে যা সস্তা খাবার আছে তাতে অপুষ্টির হার অনেক কমে যাবে । আমরা বিজ্ঞাপনের মোহে না পড়ে অল্প দামে সঠিক ও পরিচ্ছন্ন খাবার ব্যবহার করতে পারলে স্বল্পবৃত্ত নিম্নবিত্ত গরীব পরিবারের অতি সাধারণ ক্ষমতার মধ্যেও স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব।

নতুন নতুন রং ধরেছে সোনার পৃথিবীতে

রজত তরাত

চুন এবং উডওয়েলের প্রলেপে 'সাদা-কালো' কম্বিনেশনের 'আসাম টাইপ ' বাড়ি। ড্রইংরুমে 'ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ' টেলিভিশন -- বেডরুমে উঁকি দিচ্ছে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর 'সাদা-কালো' যুগল ছবি। আড়ালে - আবডালে োর অনগ্রসরতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত - রঙিন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পাড়ার মাসুল !

রং-বেরং এর পেইন্ট - ম্যাচিং ওয়াটার সলুয়েবলে ডিসটেম্পার, ম্যাচিং পর্দা-কার্পেট শোভিত আর.সি.সি বাড়ি, কালার্ড টিভি উইথ সি.ডি. প্লেয়ার, কম্পিউটার উইথ কালারড মনিটর, কালারড জেরক্স মেশিন, রং-বেরঙের গাড়ী এবং মিয়াঁ -বিবির পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগুলোর ব্যবহার -- এসব হচ্ছে যুগোপযোগী, কর্ম্যদ্যম সফল মানুষের বর্তমান পরিচয় -- সমাজে বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে চলার অলখিত নিয়ম। এই সমাজের তথাকথিত সফল এবং সার্থক ব্যক্তিরা 'ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ' টিভিকে 'অবসলিট ' আখ্যায় ভূষিত করে গৌরব বোধ করেন -- 'সাদা-কালো' ফটো এদের ভাষায় 'আউটডেটেড' -- বয়সের ভারে জর্জরিত অসহায় বৃদ্ধ মা-বাবারা এদের কাছে 'লায়াবিলিটি' । যে 'ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ' টিভি ছিল সকলের নয়নের মনি, আজ তা অবহেলিত -- অবাঞ্চিত -- 'না রাখা যায় না ফেলা যায় ' পর্যায়ভুক্ত হয়ে অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে মাইল মিশে একাকার -- বৈমাত্রেয় আচরণের শিকার। বাপ্ -ঠাকুর্দার মধুর স্মৃতি - বিজরিত 'সাদা-কালো' ছবি প্যাকেট বন্দি - আজকালকার 'রঙিন' ছবির সাথে ফটো আলব্যামে এগুলোর স্থান হয় না -- পাচ্ছে কৃত্রিম আভিজাত্যে কলংক লাগে। মহেন্দ্র দত্তর 'কালো ছাতা ' আজকাল অচল -- বাজার চেয়ে গেছে লাল, নীল সবুজ ছাতায় -- দেশি মেমসাহেবদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত রং এর বাহার। লাল নীল 'হেয়ার ব্যান্ড' দিয়ে শুরু - ম্যাচিং 'লিপস্টিক', ভ্যানিটি ব্যাগ' ইত্যাদি হয়ে ম্যাচিং 'নেল পুলিশ' এবং 'চপ্পলে যার শেষ' . দেওয়ালে আঁটকানো স্বামী-স্ত্রীর 'সাদা-কালো' ছবির বদলে আজকালকার হাই -ফাই মহলের মিস্টার এবং মিসেসের নানা ভঙ্গিমায় বল-ডান্সার 'লেমিনেটেড কালার্ড ছবি' ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করে। আসল-নকল, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর বিচারের ক্ষমতা এদের নেই - আছে শুধু চোখে লাগার ব্যাপার। বাজারে 'কৃত্রিম রং' এ রাঙানো শাক-সবজি, খাদ্য সামগ্রীর শিকারও এরাই - এমনই এদের 'রং' এর প্রতি দুর্বলতা। মাথার চুল সাদা হয়ে গেলে এরাই তখন ছোটেন পার্লারে সাদাকে কালোতে রূপান্তরিত করতে। প্রকৃতির নিয়ম এরা মানতে নারাজ।

জীবনের খেলাঘরে রং এর পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা হয়ে গেছি 'রঙিন' কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ যে হয়ে উঠছে 'সঙ্গিন ' -- এটা আমরা বুঝব কবে ?

A TRIP TO ICELAND: THE LAND OF ICE AND FIRE

K K Satapathy

Iceland, a small island country located at the juncture of North Atlantic and arctic oceans is known as the land of fire and ice, being home to both glaciers and volcanoes. Substantial part of Iceland is actually covered in snow. I had a taken a three days trips to Iceland in October,2018 as a part of the group tour and was completely enchanted by the country. We started from Kolkata by air and flew into Reykjavik, the capital of Iceland after two stopovers at Doha (Qatar) and Oslo(Norway) respectively.While descending I could see through the window the Atlantic sea, the vast coastline and the beautiful landscape. Upon arrival, we were transferred to a bus waiting outside the airport. Iceland is one of the most expensive country. I had to pay 5-dollar commission for exchanging 20 dollars to Iceland Kroner.

Driving along snowy road

Our driver cum guide was very knowledgeable about Icelandic history, geology and culture. He shared many scientific facts regarding volcano, tectonic plate, northern and southern lights.Our itinerary took us for a drive through the Northern part of the Golden Circle, a 300 km popular tourist route,comprising the Gullfoss waterfall, the Strokkur geyser and Thingvellir national park, the biggest tourist draws in Iceland. The road network in Iceland is very good and we drove through a beautiful four lane highway. The temperature was below zero degree. The guide told it is a volcanic island covered with volcanic black coloured lava without any trees or vegetation.

After some distance, we entered snow covered area – a vast sea of snow and ice all around. The driver cum guide told they put salt on the road to melt ice, black topping also helps.

The Driver started giving some introduction about the country. Human settlement began here in 9th century. They came from Scandinavian countries, Scotland, Ireland etc. The total population is 3.45 lakh of which 2/3rd live in the capital; the rest in coast line and fishing villages. Fishing is a big industry.Iceland is the second biggest fishing nation in Europe. There are 1800 farms mostly of livestock dairy, sheep, horses etc. Ocean does not freeze here because of Atlantic Ocean winds. Now a days sunrises at 9AM and sets at 5PM. Some time sunrise and sunset times are 11-30AM and 2 PM respectively with only 2 sunlight hours. In summer time, there is midnight sun. In mountainous areas the temperature goes below -30^0 C. Eighty-five percent of the energy are from geothermal and hydro energy. The country is self-sufficient in growing fruits and vegetables due to greenhouse cultivation. The language spoken here is Icelandic, one of the oldest spoken language of the world.

People walking between tectonic plates

Our first stop was Thingvellir national park. The park with an area of 240 square kilometer is a unique geological site where tectonic plate boundary along the floor of the Atlantic Ocean separated North American and Eurasian continents (continental drift). This can be clearly seen in faults and fissures which traverse the region.Here one can literally walk in the divide between two continents. The tectonic plates are still moving apart at approximately 2.5 cm a year. The outstanding scenery with its cliff walls, fissures, lava fields, grassy plains give the area unparallel value. Thingvellir also is the site of oldest parliament in Europe which used to meet centuries starting from 930 upto 1781 AD. The park has been designated as a world heritage site since 2004.

Our next destination was Haukadalur geothermal valley with large number of geyser or hot springs. On the way we drove through undulating snow-covered terrain. Some horse farms were visible with horses grazing in the snowy grasslands. The horses are reared here for racing as well as meat. In the Haukadalur geothermal area, there are large number of geyser/ hot springs emerging from underground along with smoke due to geothermal activity creating varying sized pools of bubbling hot water of temperature of around 105^{0}C. The main attraction was, however,few erupting springs (called strokkur geyser) where water bursts out like explosion with lot of smokes every 5-6 minutes with jet of water column reaching 100 feet in the air. Many tourists wait there for long time to watch this spectacular phenomenon.

Geyser geothermal area

The next stopping place was a series of water falls known as Gulfoss water fall or golden water fall. This is one of islands most popular tourist attraction and iconic water fall. The water here travels from the Langjokullglacier cascading down in two stages into a rugged

canyon with walls reaching up to 70 meters. Gulfoss Gorge was formed by flash flood waters that forced their way through cracks in basalt lava. It looks very beautiful with the whole area covered with snow.

Gul foss waterfall

We had a night halt at Hvolsvollur, a small town in the south coast with population of about 1000 people, about 150 km from capital city Reykjavik. Iceland is a great place to see northern light(aurora boreales). We went out of the hotel and drove through the ice-covered road to the outskirts facing biting cold to watch it at night. We, however, failed to see northern light owing to cloudy weather. Next morning at 9-30 AM, we started our journey along the south shore of Atlantic reaching our first stop Skogafoss waterfall after about 40 minutes journey. Scogafoss is one of the biggest water falls in Iceland with a drop of some 60 meters and width of 25 meters.

The water underneath is very flat; one can walk right up to the wall of the water. It was just overwhelming standing next to it.

Scogafoss water fall

We drove another 30 km on the ring road to reach world famous Reynisfsara black beach adjacent to Atlantic sea. The coastline beach has black sand because of worn out black volcanic rock formed when lava cooled and solidified. The exciting scenery is made more extraordinary by towering mountain cliffs, basalt sea stacks and caves, hexagonal shaped basalt columns forming a remarkable architectural work. There are also two giant parallel rocks or sea stacks a little away from the shore into the ocean. The Atlantic sea waves are powerful, sometimes potentially dangerous. There are coastal sneaker waves appearing unexpectedly with much greater force and height pushing the waves further up the beach. We were advised not to turn back on the sea.

Reynisfsara basalt sea stack and black beach

We had lunch at the nearby Vik town, which is a popular stop over for tourists exploring the southern coast of Iceland. We had long 2.5 hours straight drive on the main ring road passing through a uneven desolate areas with many hilly outcrops devoid of any vegetation and covered with lava strewn around, remnants of volcanic eruption. It can be called black desert. After the long drive, we reached Jokulsarion, the famous glacial lagoon. The lagoon offers magnificent sights of blue and white icebergs gliding in silent procession making their way to Atlantic Ocean.

The lagoon is filled by melt water and chunks of icebergs - some are very high – breaking off from the glacier. The site has been used in many Hollywood movies. However, Jokusarlon also stands testimony of grim reality of global warming. The lagoon has been formed rather recently in 1935. It is accelerating at an alarming rate and increased fourfold since 1970s. We took a boat tour into the lagoon to get close to the icy giants. However, our excitement was somewhat moderated owing to heavy downpour.

Floating iceberg in Jokulsarion lagoon

Next morning at 9 AM we started our journey for the capital city Reykjavik some 150 km away.

The sun was just rising; the temperature was -30^{0}C. On the way in a short distance visited two water falls Seljalandsfoss and Urrioafoss. There were no plants or trees on the way, only some grassy land with some horse breeding and cattle farms in few places. From the distance snow clad mountains were visible. It is jocularly said that if there are three trees seen in close proximity, it may be called a forest in Iceland. We passed through Selafoss town inhabited by 5000 people, mostly known for agricultural activities like animal slaughter houses and the like.

The driver cum guide shared lot of information about volcanos in Iceland. Major portion of the volcanic eruption in the world occurs in Iceland. Every fourth year there is a volcanic eruption.

There are 130 active volcanoes in Iceland, though some of the volcanoes did not erupt last 1000 years. There are, however daily small scale eruptions (1.5 Richter scale or so) in some mountains. In 2008, there was an earth quake of 6.5 Richter scale. Iceland is pioneer in the use of geothermal energy for space heating. There are geothermal power plants in different areas using geothermal energy. Water with temperature more than 100^{0}C flows out in mountainous areas. Hot water supply to capital and other areas are done from these sources.

A geothermal power plant

In Iceland, water is very pure. We drove through four lane mountain road totally covered with snow with sparkling white field all around. At the end of the snow covered area, we entered the Reykjavik city. Paradoxically, there were quite a few coniferous type trees visible inside the city.

Reykjavik is the commercial, industrial and cultural center of the island country. Reykjavik boasts a colorful history dating back to days of Viking. However, until 20th century, it was a small fishing village. At present, with nicely coloredbuildings, brightly painted houses, nice clean roads, it gives a superb picture like look. Standard of living is very high in Iceland. There are hundreds of cars on the road. In human development index it is second in the world next to Norway. Icelanders are not only book lover, 10% of Icelanders publish a book in their life time. Crime rate is very low; hardly any policeman visible on the roads. Though a member of NATO, Iceland has no army. However, during second world war and cold war period, US navy was deployed there. American president Ronald Reagan and Soviet leader Mikhail Gorbachev met here in 1986 to end the cold war.

Rykjavic City Port in Rykjavic

We first visited the volcano house where some volcano erupted materials have been displayed.

There were two film shows depicting Iceland's mighty volcanos and their eruptions as well as the islands unique geological structure. There is a tectonic separation of 2cm every year making it volcanic eruption prone. In 1973, 5000 people had to be evacuated.Our next visit was to a northern light show where northern lights in different counties were shown by way of film shows. The next stop was the Lutheran parish church(Hallgrimskirkja church) located on a hill top at the end of the city. At 74.5 m tall and 18040 square ft interior, it is the largest church in Iceland and among the tallest structure of the country. However, according to the guide, people are not at all religious here, may visit at the most twice in a year. We then took a walking tour to get the sense of the city passing through streets, parks, markets, restaurants, book stores etc. We had dinner in an restaurant; to our pleasant surprise, it was owned by a Malayali couple from Kerala. According to him, there are quite a few Indians reside in the city.

Hallgrimskirkja Church

With Reykjavik city tour, our trip came to an end. Iceland is a wonderland with so many fascinating and unreal things to see or do here. It was really so unique and amazing experience that I would remember for a long time.

নিউইয়র্ক শহর ভ্রমণ

তনুরূপা কুন্ডু এবং দিলীপ কুন্ডু

২০১৯ এর নভেম্বর মাসে আমরা আমেরিকার টেক্সাসে মেয়ের কাছে কয়েক মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। টেক্সাসের ডালাস্ শহর থেকে ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহের জন্য মেয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্ক ট্যুর করেছিলাম। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটা কিস্তি লেখা হয়েছে আমাদের। তার একটা কিস্তি এখানে দিলাম।

... ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম দুই দিন কাটিয়ে সেখান থেকে আমরা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার Amtrak ট্রেন জার্নি করে সন্ধ্যে বেলায় নিউইয়র্কের Pennsylvania (Penn) স্টেশনে পৌঁছালাম। Penn স্টেশন চত্বরের একটা বিখ্যাত Food Court থেকে এক্সট্রা লার্জ সাইজের একটা পিজা কিনে Uber ক্যাবে আধঘন্টা জার্নি করে Lower Manhattan এর Hilton Garden Inn হোটেলে পৌঁছালাম। Hudson নদীর ধারে অবস্থিত এই হোটেলে পঁচিশ তলার একটা river/bay facing রুমে চেক্ ইন্ করতে রাত আটটা হয়ে গেল। ভীষণ টায়ার্ড ছিলাম বলে সঙ্গে আনা পিজা দিয়েই ডিনার সেরে ঘুমিয়ে পরলাম। .....

গতকালের সঙ্গে আনা পিৎজাটা সাইজে এতটাই বড়ো ছিল যে তিনজন মিলে ডিনারে শেষ করতে পারিনি। সকালে রুমের ভিতরে রাখা মাইক্রোওয়েভে বাকিটা গরম করে কিছু ফল আর কফি সহযোগে প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। এরপর হোটেল থেকে বেড়িয়ে ঠিক করলাম পায়ে হেঁটে চারিদিকটা একটু দেখি। Subway station, city bus service কতদূরে এগুলো জানা দরকার। দেখলাম সবই খুব কাছাকাছি। আমার মেয়ে প্রথমেই আমাদের তিনজনের জন্য পাঁচ দিনের subway train এর টিকিট কেটে নিল। এখন আমরা পুরো নিউইয়র্ক শহরের যে কোনো জায়গায় অতি সহজেই পৌঁছাতে পারব।

যেহেতু আমরা lower Manhatan এ ছিলাম তাই ভাবলাম আমরা নিউইয়র্ক সিটি ট্যুর শুরু করি financial centers থেকে। হোটেল থেকে মাত্র পাঁচশ মিটার হেঁটেই আমরা পৌছে গেলাম Wall Street এ। এই street শুধুমাত্র আমেরিকাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্র (financial centre)। এখানেই আছে সেই বিখ্যাত Charging Bull। ষোলো ফুট লম্বা, এগার ফুট চওড়া এবং 3200 কিলোগ্রাম ওজনের এই ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুকে বিশ্ব বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে মান্য করা হয়। 1987 সালের বিশ্ববাণিজ্যে যে গভীরতম আর্থিক মন্দা এসেছিল তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় 1989 সালে December মাসে এই স্ট্যাচুটি স্থাপনা করা হয়।

এই Charging Bull স্থাপনার পিছনে একটা ছোট গল্প আছে। সিসিলিয়ান শিল্পী Arturo Di Modica এই স্ট্যাচুটি তৈরি করে 14th December 1989 রাতের অন্ধকারে নিউইয়র্ক স্টক্ এক্সচেঞ্জের সামনে ফেলে রেখে যায়। পরদিন সকালে পুলিশ সেটা দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে এবং এক সপ্তাহ পরে মূর্তিটা Bowling Green পার্কের পাশে Wall Street এর উপরে স্থাপনা করা হয়। কথিত আছে এই মূর্তি স্থাপনার পর বিশ্ব বাণিজ্যে অগ্রগতির জোয়ার আসে। সেইজন্য এটা নিউইয়র্কের একটা অন্যতম দর্শনীয় স্থান। প্রতিদিন এখানে হাজার

হাজার দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। এর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ওই স্ট্যাচুর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য আমাদের কম পক্ষে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এরপর Wall Street ধরে আধা কিলো মিটার হেঁটে আমরা পৌছলাম বিশ্ব বিখ্যাত New York Stock Exchange এর সামনে। এটা পৃথিবীর বিখ্যাত স্টক্ এক্সচেঞ্জ যেখানে বিভিন্ন নামকরা কোম্পানির পঞ্জিকৃত শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 30 ট্রিলিয়ন ডলার। গড়ে প্রতি দিন এখানে শেয়ার কেনা বেচার পরিমাণ প্রায় 170 বিলিয়ন ডলার। এটা 1792 সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক স্টক্ এক্সচেঞ্জের সামনেই একটা চার ফুট উচ্চতার ছোটো মেয়ের ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে। মেয়েটি স্টক্ এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং এর দিকে তাকিয়ে আছে। এই ছোট মেয়ের মূর্তিটি The Fearless Girl নামে পরিচিত এবং এই স্ট্যাচুটি নারী সশক্তিকরণের প্রতীক।এই স্ট্যাচুর পাশে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের ছবি তোলার ভিড় লেগেই থাকে সবসময়।

এরপর আমরা subway (পাতাল রেল) train ধরে ওয়াল্ স্ট্রিট থেকে সোজা Canal Street স্টেশনে এসে নামলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আজকের লাঞ্চ একটা বিখ্যাত Chinese রেস্টুরেন্টে করব। Canal Street ধরে একটু হাঁটলেই নিউ ইয়র্কের Chinatown। চায়না টাউনে পৌঁছে দেখি পুরো চীন দেশটাই যেন উঠে এসেছে এখানে। রাস্তার দুধারে ইংরেজি ও চাইনিজ ভাষায় লেখা হোর্ডিং, চাইনিজ প্যাগোডা আর ফুটপাতে অনেক চাইনিজ মহিলাদের চাইনিজ পণ্য পথচলতি মানুষের কাছে বিক্রির অদম্য চেষ্টা। রাস্তায় ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা পৌছলাম 'Joe's Sanghai' নামের একটা authentic chinese restaurant এ। রেস্টুরেন্টের সামনের ভিড় দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় এই রেস্টুরেন্ট। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর আমরা একটা টেবিল পেলাম। আমরা লোভে আর ক্ষিদেয় অনেক কিছু অর্ডার দিয়ে ফেললাম। অনেক খেলাম, তবুও পুরো খাবার শেষ করতে পারলাম না। তাই বাকি খাবার রাতের জন্য প্যাক করিয়ে নিলাম।

এখান থেকে আবার subway train ধরে Brooklyn স্টেশনে নামলাম ব্রুকলিন ব্রীজ দেখব বলে। কিন্তু ততক্ষণে বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। দূর থেকেই Brooklyn Bridge দেখে পরে আবার আসব এই ভেবে subway train ধরে হোটেলে ফিরলাম। তখন প্রায় বিকেল সাড়ে চারটে। তিনজনেই বেশ ক্লান্ত। আবার কাল ভোরে উঠে cruise ধরে Ellis Island আর স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে যাব বলে আমরা আর কোথাও গেলাম না। হোটেলেই বিশ্রাম নিলাম। আমাদের নিউইয়র্ক ভ্রমণের প্রথম দিনে তোলা কিছু ছবি নীচে দিলাম।

9202

SUSHI

ডুয়ার্স ট্যুর: রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম

তনুরুপা কুন্ডু

জলদাপাড়ার জঙ্গলে আমরা বাইসন, গন্ডার, হরিণ ও অনেক ময়ূর ছাড়াও নানা ধরনের পাখি দেখে খুব খুশি।

মন আরো জঙ্গল দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। সময়ের অভাবে আমাদের ট্যুর গাইড বক্সা জঙ্গলকে আমাদের অরিজিনাল সাইট লিস্টে রেখেছিল না। আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক্ আমরা সময় ম্যানেজ করে পরের দিন বক্সা জঙ্গল সফরি করব। তাই ঠিক হলো পূর্ব নির্ধারিত সকালের দর্শনীয় স্থান গুলো আমরা তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে বক্সা জঙ্গল দেখতে যাবো। আগের দিন (06/05/2022) তাড়াতাড়ি ডিনার করে পরদিন সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব বলে ঠিক করলাম।

আজ (07/05/2022) আমাদের ট্যুর প্ল্যানে সকালে রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম, জয়ন্তি ও মহাকাল মন্দির আর দুপুরে খাওয়ার পর বক্সা জঙ্গল সফরি। আমরা ব্রেকফাস্ট করে তৈরি হতে না হতেই আমাদের দুটো ইনোভা এসে হাজির। আমাদের গ্রুপের বারোজনকে নিয়ে দুটো গাড়ি ছুটে চলল, আমাদের প্রথম গন্তব্য রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম অভিমুখে। রাস্তার দুই ধারের অপূর্ব দৃশ্য। হেক্টরের পর হেক্টর ঘন সবুজ চা বাগান, কোনো কোনো চা বাগানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকেরা পিঠে বিশেষ ধরনের ঝুড়ি নিয়ে চা পাতা তুলতে ব্যস্ত। পথে যেতে যেতে বেশ কয়েকটা tea estate দেখতে পেলাম। কোথাও দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে ম্যাজেন্ডা রংয়ের ফুলে ভরা জারুল গাছের শোভা। দেখতে দেখতে আর নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে আমরা পৌছে গেলাম রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামে। মাদারিহাট থেকে এর দূরত্ব প্রায় 30 কিলোমিটার। চারিদিকে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নিরিবিলি কিন্তু বিভিন্ন পাখিদের কলকাকলিতে ভরা একটা ছোট্ট জনপদ রাজাভাতখাওয়া। এটা বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশ পথ।

অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন, অর্কিড, বন্যপ্রাণী পাখিতে ভরা এই রাজাভাতখাওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। একসময়ে (1765 সালে) প্রতিবেশী দেশ ভুটানের রাজা দেবরাজ বক্সা জঙ্গলকে ভুটানের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করলে কোচবিহারের রাজা ধৈর্য্যনারায়ণ এর চরম বিরোধিতা করে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ধৈর্য্যনারায়ণ ভুটানের রাজার হাতে বন্দী হন। তখন রাজার মুক্তি ও নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য কোচবিহারের রাজপরিবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারস্থ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপারটাকে প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তী কালে নিজেদের স্বার্থের জন্য রাজি হয়। 1774 সালে ব্রিটিশ সেনার সাহায্যে কোচবিহারের রাজাকে ও বক্সার জঙ্গলকে ভুটানের কব্জা থেকে উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘকাল বন্দি থাকার পর যখন রাজা ধৈর্য্যনারায়ণ নিজের দেশ কোচবিহারে ফিরেছিলেন তখন রাজ পরিবারের তরফ থেকে এই অঞ্চলে একটি মহাভোজ সমারোহের আয়োজন করা হয়েছিল, বাঙালি ট্রাডিশনাল ভাতের সঙ্গে নানা উপকরণ সহ। রাজা মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এই অঞ্চলে ভাত খেয়েছিলেন বলে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় রাজাভাতখাওয়া। ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য বনদপ্তর এখানে তৈরি করেছে একটা মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের

গায়ে রাজামশাইয়ের সপার্ষদ দেশে ফিরে আসার দৃশ্য আঁকা ও লেখা রয়েছে বড়ো বড়ো করে। মিউজিয়ামে বক্সা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি ছাড়াও রাখা আছে বক্সা জঙ্গল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ (যেমন মৃত হাতির ভ্রূণ)। কিন্তু এসবের ছবি তোলা বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।আমরা বেশ কিছুটা সময় এখানে কাটিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

একটি ভ্রমণ কাহিনী

বিনয় কুমার সাহা

সালটা ১৯৮৯ জুন মাস, প্রথম বার কাশ্মীর ভ্রমণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় (২০১০ ও ২০১১)। আমরা সেই বার আটজন ছিলাম, দুই বন্ধু, আর এক বন্ধু ও তার স্ত্রী ও ছেলে ও আমরা তিনজন মানে আমার স্ত্রী ও ছেলে। আমার ছেলের বয়স তখন তিন বছর। আমাদের যাত্রা ছিল হিমগিরি এক্সপ্রেসে। আজ এই কাশ্মীর ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের শোনাবো। যথাক্রমে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রাত ১১.৩০ ট্রেন ছাড়ল, সেই রাত কেটে গেল পরের দিন ও রাত কাটিয়ে ভোরে আমরা জম্মু পৌছলাম। যথারীতি আমরা যখন মালপত্র নিয়ে স্টেশনে নামি তখন আমাদের ই এক পরিচিত শালওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের রিসিভ করার জন্য। একটু বলি, এই শালওয়ালা ম:গুলাম হাসান প্রতি বছর আমাদের অফিসে কাশ্মীরী শাল নিয়ে আসত সেই সুবাদে ওর সাথে পরিচয় হয়ে ছিল এবং ওকে জানিয়ে ছিলাম যে আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি।

যাইহোক সুদূরে একজন পরিচিত পাওয়া যে কতখানি দরকার সেদিন আমরা বুঝেছিলাম কেননা জম্মু তে আমরা কোন হোটেল বুক করে যায়নি এবং এত রাস ছিল যে কোন হোটেল খালি ছিল না যাইহোক ওই আমাদের ব্যাবস্থা করে দিল একটা বাড়িতে যেটা নতুন কন্ট্রাকসন হচ্ছিল, জানালা ও দরজায় কোন রকম পর্দা টানিয়ে মোমবাতির আলোয় সেই রাতটুকু কোনো রকমে কাটিয়ে ভোর ছটায় আমরা জম্মু ও কাশ্মীর গভার্নমেন্টের বাসে শ্রীনগর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। জুন মাস জম্মুতে ও তখন প্রচন্ড গরম ছিল।অবশেষে যখন বানিহাল টানেল পাস করলাম তখন একটা ঠান্ডার আমেজে মনটা জুরিয়ে গেল। যাত্রা পথ সত্যি মনোরম আর ও এক সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখে সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম, একটা বাচ্চা মেয়ে পরনে সতছিদ্র জামা পরে কিছু কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত সেই দৃশ্য সত্যি ভোলার ছিল না,মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে কোন এক পরি মর্ত্যে এসে নেমেছে, এরকম আরো কত কিছু দেখতে দেখতে পাঁচটা পাহাড় পেড়িয়ে অবশেষে শ্রীনগর এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধে ছয়টা। অবশ্য এখানে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি কারন স্টেট ব্যাংকের হলিডে হোমে তিনটা ঘর বুক করা ছিল। দেখতে দেখতে এইভাবে আমাদের চার দিন কেটে গেল। যাইহোক আমরা মালপত্র গুছিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম। সেই দিনের মত ইতি হলো। পরের দিন শুরু হলো ভোর ছয়টায় ঘরে ঘরে হোটেলের বেড টি দিয়ে। তারপর প্রাতরাশ সেরে হলের দিকে যাব দেখি পাশাপাশি হোটেল থেকে সবাই এসে আমাদের ই হলে জমায়েত হয়েছে রামায়ন সিরিয়াল দেখার জন্য। মনে হয় ওই হোটেলেই বোধহয় একমাত্র টিভি ছিল। সুদূর কাশ্মীরে ও ওই সময় বাঙালী পর্যটকরা সব ভুলে রামায়ণ দেখার জন্য ব্যাস্ত হয়ে পরত।

আমরাও সেদিন ব্রেকফাস্ট প্যাক করে সাইটসিইংয়ে যাবার জন্যে তৈরি ঠিক তখনই মহম্মদ গুলাম হাসান এসে হাজির কি না পরের দিন ওর ভাইয়ের বিবাহ তাই আমাদের সবাইকে বরযাত্রী যেতে হবে।যথারীতি পরের দিন প্রোগ্রাম বিয়ে বাড়ি কিন্তু কেহই যেতে রাজি হল না অগত্যা আমাকেই বরযাত্রী যাবার জন্য গুলাম হাসানের বাড়িতে পৌছতে হল এবং ওইখান থেকে দুইটি বাস রিজার্ভ করে কনের বাড়ি রাত নয়টায় পৌছলাম। যাইহোক কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরিদের বিয়ে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ওদের আচার ও অনুষ্ঠান দেখে সত্যি মন ভরে গেল দেখলাম কনের বাড়ীর মহিলারা ঢোল বাজিয়ে গান ও নাচ করছে, আর একটা জিনিস দেখলাম বর ও কনে দুজনেই টাকার মালা পরে আছে। তারপর খাবার পালা সেখানে ও এক সুন্দর জিনিস দেখলাম, একটা বড় থালার সামনে পাঁচ জন করে বসে আছে ও থালাতে স্তুপাকার করা বিরিয়ানি

সাথে বড় বড় মাটনের পিস। অবশ্য আমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সেদিন আমার মনে একটু দ্বিধা হয়েছিল বিফ ভেবে এবং গুলাম অনুরোধ করা সত্বেও আমি খেতে পারিনি এবং আমার দ্বিধাটা ও বুঝিয়ে দিল যে কাশ্মীরীরা বিফ খায় না। ও গুলো ছিল ভেরার মাংস। এতে হয়ত গুলাম একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল যাইহোক কি করা যাবে সে রাতটা গুলামের বাড়িতে থেকে যেতে হল ও ভোরের আলো ফুটতেই হোটেলের দিকে রওনা হলাম।পরের দিন অবশ্য গুলামের বাড়ির অনুষ্ঠানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন ও আমাদের জন্য চিকেন, রাইস ও মেটে দিয়ে একটা সাক করে ছিল সেটা আজও ভুলতে পারিনি। ওদের এই আতিথেয়তা সত্যি কোনদিন ভুলতে পারবনা। এবার ফেরার পালা সেই হিমগিরি এক্সপ্রেসে সেখানেও ছিল চরম অভিজ্ঞতা।